দ্বিতীয় অধ্যায় :- ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার শ্রেণী বিভাগ ও তার বিষয়বস্তু - তাঁর কাব্য-ভাষার উপাদান ।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন । তাঁর কবিত্বের বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করন তৈরী করেছেন । তিনি বুঝেছিলেন এইসব কবিতা শুধু বর্তমানযুগের পাঠকের মধ্যেই শেষ করলে চলবে না , তাই এদের বিনষ্ট হতে দেন নি । ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা সাহিত্যের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিল গুপ্তকবির কবিতায় তা আমরা দেখতে পাই । বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষাকে তিনি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন । বাঙ্গালীয়ানাই ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার বৈশিষ্ট্য । সহজ , সরল , সাবলীল ভাব তিনি তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন । প্রাচীন আধুনিক দুই যুগের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে দুই যুগকে একসূত্রে গেঁথেছেন । একদিকে প্রাচীন অতীত , আর একদিকে অনাগত ভবিষ্যৎ । সুতরাং ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সূত্র দুটি কেমন করে সমন্বয় সাধন করেছে তা বোঝা যায় ।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাকে ৬ টি ভাগে বিভক্ত করেছেন । যথা –
ক) নৈতিক ও পারমার্থিক খ) সামাজিক ও ব্যঙ্গ গ) রসাত্মক ঘ) যুদ্ধ বিষয়ক ঙ) ঋতুবর্ণন চ) বিবিধ । এছাড়া তিনি শকুন্তলার কাহিনী নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন । সারদামঙ্গল বা উমা মেনকা প্রসঙ্গে কবিতা লিখেছেন । কাব্য কানন , রসলহরী , কবিতাগুচ্ছ তিনি রচনা করেন । এছাড়াও তাঁর কিছু কবিতা আছে অশ্লীল মনে করে বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে তারা স্থান পায় নি ।

এবার ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার শ্রেণীবিভাগ গুলিকে আলোচনা করে তার বিষয়বস্তু ও ভাষা নিয়ে আলোচনা করব ।

পারমার্থিক ও নৈতিক :-

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাবলীর মধ্যে পারমার্থিক ও নৈতিক পর্যায়ের কবিতা তিনি সবচেয়ে বেশী লিখেছেন । এই পর্যায়ে ১৬ টি কবিতা আছে । স্রষ্টার স্বরূপ এবং সৃষ্টির রহস্য এই পর্যায়ের কবিতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । সমসাময়িক বিষয় ও ঘটনার উর্ধ্বে তিনি যে বিচরন করতেন এই সব কবিতাগুলি পড়লেই তা বোঝা যায় । ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও দৃষ্টিশক্তির সীমার মধ্যে তাঁর কবিমন আবদ্ধ থাকে নি । ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় ও তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে । মনের ও ধ্যানের দৃষ্টিতে যাকে উপলব্ধি করা যায় সেই ধ্যাননব্ধ সত্যদর্শন তাঁর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে । জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের প্রাথমিক জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়বোধ তাঁর এই শ্রেণীর কবিতার বিষয়বস্তু । জন্মগ্রহনের পর মানুষের মনে যে প্রশ্নগুলি জাগে সেটাই এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে । এতে বোঝা যায় অধ্যাত্মবোধ ও জীবন জিজ্ঞাসায় ঈশ্বরচন্দ্রের কবি কল্পনা খুব বেশী ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি । আর এই অধ্যাত্ম প্রশ্ন গুলির কোন সমাধান তিনি করেন নি , তাই প্রশ্নগুলি প্রশ্নরূপেই তাঁর কবিতায় স্থান জুড়ে রয়েছে । হয় তিনি এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান নি নতুবা সংস্কার- বিশ্বাস ও সাধনার বলে সামঞ্জস্য - সিদ্ধান্তের দ্বারা আশাবাদী হয়ে পড়েন । নৈরাশ্যবাদী কবির দ্বন্দ্ব - সংশয় - হতাশা , আর্তি যেমন তাঁর কবিতায় চোখে পড়ে না তেমনি আবার আশাবাদী কবির উল্লাস , জয় ঘোষণা বা ঈশ্বরের মহিমাব্যঞ্জক আনন্দময় রূপের কোন প্রকাশও নেই । এতে মনে হয় অধ্যাত্ম প্রশ্নগুলি সাধারণ শ্রেণীর কৌতূহল কবিকে বিশেষ ভাবে ভাবিয়ে তুলতে পারে নি ।

যেমন — ধর্ম্মভেদে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ভেক্
উদ্ধারের কর্ত্তা সেই সারমাত্র এক ।।
(সার উপদেশ)

ভগবৎ - সাধনার প্রকৃষ্ট পথের নিশানা কবি ব্যক্ত করেছেন । আচার সর্ব্বস্ব পরমার্থকামীদের উদ্দেশ্যে তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণার মনোভাব কবি ব্যক্ত করেছেন এই শ্রেণীর কবিতায় । বিশ্ব-নিখিলের দেবতা গৃহে খণ্ডরূপে আবদ্ধ, বাইরে তিনি অখণ্ডরূপে বিরাজিত । এই অখণ্ডরূপ দেখার জন্য সন্ন্যাসীরা গৃহত্যাগী হয়, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধারণ মানুষের ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা করে । এদের প্রতি কবি বিদ্রুপ বাণী নিক্ষেপ করেছেন —

ঘরে ঘরে ফের যদি ঘর ছাড়া হয়ে ।
ঘরে ছেড়ে কিবা কাজ থাক ঘর সয়ে ।।
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি গুন হাপু ।
এমন সন্ন্যাসে তোর ফল কিরে বাপু ।। — (পরমার্থ)

ভগবানকে সাধনার জন্য প্রয়োজন মনকে পবিত্র করা । মনকে পবিত্র না করে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান করে দেবতাকে পূজা করলে তাঁকে পাওয়া যায় না ।

ঠক্ ঠক্ শব্দ করি ঘরাতেছ মালা ।
ভাবিয়াছ দশের যশের তুমি শালা ।।
চাল নাই, খুঁটি নাই, নাই গুন লেশ ।
কেমন হইবে শালা বল না বিশেষ ।।

ঠক্ ঠক্ ঠোকে যাবে, আয়ু ফুরাইলে ।
কি হইবে মিছামিছি মালা ঘুরাইলে ।।
হৃদয় পবিত্র নহে, কিসে রবে সুখে ।
না বুঝিয়া পরিনাম, হরিনাম মুখে ।। — (পরমার্থ)

এই শ্রেণীর কবিতাগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় যে ভক্তি ও সাধনার পথে বেশীদূর অগ্রসর না হলে ও অধ্যাত্ম সাধনার প্রকৃত পথের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন । বিশ্বাস এবং ভক্তি থাকলে এপথ দিয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় । সংস্কার - প্রথা - নিয়ম, পূর্ব্ব - সংস্কার তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি । তাঁর পারমার্থিক কবিতা - গুলি পাঠ করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় । যে মতের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মিল নেই সে পথকে তিনি পরিহার করেছেন । তাঁর মত সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী, ভগবৎনিষ্ঠ সে যুগে আর দেখা যায় নি । সংস্কারের বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে মানসচক্ষে বিশ্বদেবতাকে তিনি দেখেছেন ।

যেমন —

স্বভাবে তিমিরময় অখিল সংসার ।
আলোরূপে তবরূপ হতেছে প্রচার ।।
যদি না প্রকাশ পায় প্রতিভা তোমার,
জগৎ কি হতে পারে শোভার ভান্ডার ?

তাঁর নৈতিক পর্যায়ের কবিতায় দেখা যায় যে কবিতাগুলি নীতিকথা মূলক কবিতার রূপ নিয়েছে কাব্য হয়ে উঠতে পারে নি । উচুঁ দরের কবিতা না হলেও এই কবিতাগুলির মাধ্যমে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিমানসের পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন —

হিতাহিত সদসৎ, সঙ্গের অধীন ।
অসতের সঙ্গগুনে সাধু হয় হীন ।।
অতিহীন কীট যদি, ফুলে স্থান পায় ।
অনায়াসে স্থান পায়, দেবতার পায় ।।

সেকাল ও একালের যুগ সন্ধিক্ষণে ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব । আদর্শভ্রষ্টতা ও চারিত্রিক দৈন্যতা বাংলার সমাজে তখন বিরাজ করতো । ঈশ্বরগুপ্তের মনে ও তখন এই আলোড়ন সাড়া জাগিয়েছিল —

সর্বশাস্ত্রে সুপন্ডিত কিন্তু এ কি বিপরীত
ভিতরেতে অভিমান ভরা ।
বিদ্যার যে সারমর্ম্ম নাহি দেখে তার কর্ম্ম
কর্ম্মে নাই ধর্ম্মের সঞ্চার ।।

আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্ম হয় না । দৈনন্দিক কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের মিলনই যথার্থ ধর্ম্ম । ঈশ্বরচন্দ্রের যুগে কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের সংযোগ ছিল না । ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করার অধিকার কারো ছিল না । ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁর মতামতের প্রকাশ তাঁর এই পারমার্থিক কবিতাগুলিতেই নিহিত রয়েছে । হিন্দু ধর্ম্মের দেবদেবীর কথা বা আচার অনুষ্ঠান পালনের কথা তাঁর কবিতায় নেই বরং আছে আচার পালনের সম্পূর্ণ বিরোধী কথা । সংসারের নিরর্থকতা প্রকাশ পেয়েছে "সব হ্যায় ফাঁক" ,"কিছু কিছু হয়," "শরীর অনিত্য", "মায়া" ইত্যাদি কবিতায় । বৈরাগ্যের সুর বার বার এতে ধ্বনিত হয়েছে । সংসারকে তিনি কখনো বলেছেন রঙ্গমঞ্চ , কখনো সমুদ্র , আবার কখনো অরন্য ।

মনকে নিবৃত্তিমুখী করার জন্য বারবার জীবনের অনিত্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রামমোহনের গানে জীবনের নশ্বরতার যে ভাব প্রকাশ পায় ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাগুলিতে সেই ধারনারই পুনরাবৃত্তি, রামমোহন আমাদের দেশের মজ্জাগত উদাসীনতাবোধকে আদ্বৈত বেদান্তের ছাঁচে ফেলে নতুন মায়াবাদের সুর শুনিয়েছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের পারমার্থিক গানগুলিতে এই নতুন আদর্শের প্রতিধ্বনি আছে। তাঁর গানে পন্ডিতী দার্শনিকতার ভঙ্গী আছে। যেমন বৈরাগ্য - শতকের অনুকরনে লেখা —

যুবতীর স্তনদ্বয় মাংসপিন্ড সার ।
কনক কলস সহ তুলনা তাহার ।।
কফ আর কাসে ভরা নারীর বদন ।
চাঁদের তুলনা তায় দেন কবিগন ।। — (হিতমালা)

ঈশ্বরচন্দ্রের এই বৈরাগ্য সূচক গানগুলিতে শিক্ষিত চেতনার ছাপ আছে। তাঁর পারমার্থিক কবিতাগুলিকে মনে হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন ধর্মচেতনার ফল। লোকাচার ও দেশাচারের মত ধর্মগত সংকীর্ণতাকে দূর করতে পারলে ঈশ্বরকে অনেক নিকটে পাওয়া যায় এবং মানুষকেও উদারতার দৃষ্টিতে দেখা যায়, তাই তিনি বলেছেন —

কত কত নদী নদ দেখি কত স্থলে ।
সকলি মিশেছে গিয়া জলধির জলে ।।
সেই রূপ বাঁকা সোজা নানা পথ আছে ।
সকলেই কাছে যাবে আগে আর পাছে ।।
নানারূপ মত বটে, তুমি এক স্থির ।
বহুবর্ণ ধেনু যথা শাদা হয় ক্ষীর ।। — (নিবেদন)

এই উদার ধর্মচেতনা ঈশ্বরগুপ্তকে পূর্বতন সংকীর্ণ বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে নিয়ে এসেছে। ধর্মের আচার মূলক দিক সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের বাঁধাকে অপসারিত করে যথার্থ সত্যকে জানার আগ্রহে তিনি তত্ত্ব কবিতায় লিখেছেন —

লোকাচারে দেশাচারে জাতিপ্রথা ব্যবহারে
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ ।
সত্যের হইলে দাস ও সকল হয় নাশ
সমাজেতে করে উপহাস ।। (তত্ত্ব)

সত্যকার ঈশ্বর ব্যাকুলতা যার মনে জাগে, সে কখনো পূজা হোম জপতপের আচার অনুষ্ঠানে আবদ্ধ হতে পারে না। বিশ্বজগৎ হ'ল ঈশ্বরের লীলা এই লীলায় যে মুগ্ধ হয়েছে সে কখনো অন্ধ আচার পালনে আবদ্ধ হতে পারে না ।

পূজা হোম জপ মন্ত্র নাহি জানি বেদ মন্ত্র
সূত্র-এ সূত্র-এ পুঁথি প্রকৃতি পড়ায় ।
কখনো পড়িনি শ্রুতি পেয়েছি যুগল শ্রুতি
শ্রুতির অধীন স্মৃতি স্মৃতি কেবা চায় ? — (তত্ত্ব)

ঈশ্বরের লীলা পূজার্চনার দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। প্রকৃতির মধ্যে সেই লীলানুভূতি ঘটে। এই ঈশ্বরচেতনা বস্তুতই দেবেন্দ্রনাথের —

" আমার চক্ষু খুলিয়া গেল , আমার হৃদয় বিকশিত হইল, আমি ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম " ।—(১)

রামমোহন রায়ের সময় থেকেই প্রতিমা পূজা এবং আচার অনুষ্ঠান বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল , দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা এবং রাম - মোহনের ব্রহ্মসভা , মিলিয়ে " নতুন তত্ত্ববোধিনী " সভা গড়লেন । ঈশ্বরগুপ্ত এই সভায় যুক্ত ছিলেন । নতুন যুগের ধর্ম চিন্তায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি পারমার্থিক ও নৈতিক কবিতাগুলি লেখেন ।

বঙ্কিম চন্দ্র অনুমান করেছেন তাঁর মনটা ছিল স্বভাব নির্লিপ্ত । সাংসারিক জীবনে অনেক মূল্যবান সম্পদ , তাঁর জননীকে তিনি হারিয়েছিলেন । স্ত্রী জীবিত থেকেও নেই , অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ , নি : সন্তান - এসব কারনেই হয়তো বৈরাগ্য তাঁর ভিতরে প্রবল আকার ধারন করেছিল । নৈতিক চিন্তাতেই তিনি লিখেছেন —

সত্য অভিমানী যারা মরি কিবা সভ্য তারা
সভ্যতার কি ভব ব্যাভার ।
কার্য্য করে দেখিয়াছি পরীক্ষায় জানিয়াছি
সভ্যতাই পাপের ভান্ডার ।। — (তত্ত্ব)

দেশাচার ও লোকাচারের প্রতিকূলে তাঁর মন্তব্য এই " তত্ত্ব " কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে ।

---

(১) ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ , দেবেন্দ্রনাথের হিমালয় ভ্রমন , আত্মজীবনী , শ্রী কানাই সামন্ত , ৪র্থ সংস্করণ , ১৩৬৮ চৈত্র পৃ : ২০১ ।

'নির্গুণ ঈশ্বর' কবিতাটিতে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব নিয়ে অনুযোগ করা হয়েছে। ঈশ্বরগুপ্তের এই ধর্মভাবনাগুলি সংকলিত হয়েছে 'প্রবোধ প্রভাকর' গ্রন্থে।

অদ্বৈতবাদ এবং ভক্তিবাদী ধর্মবিশ্বাস ঈশ্বরগুপ্তের দৃঢ় ছিল। তাঁর পারমার্থিক কবিতাগুলি এই দুই ধারার সমন্বয় সাধন করেছে। ঈশ্বর ব্যাকুলতার সঙ্গে ব্রাহ্মরীতি মিশ্রিত হয়ে তাঁর পারমার্থিক কবিতার জন্ম।

পারমার্থিক এবং নৈতিক পর্যায়ে তিনি নৈতিক চিন্তা, অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদকে অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন। তাঁর এই পর্যায়ের কবিতার বিষয়বস্তু অন্যান্য পর্যায় থেকে পৃথক। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৃথক পৃথক ভাষা ও ব্যবহার করেছেন। এই পর্যায়ের কবিতায় তিনি শুদ্ধ এবং বেশীর ভাগ সাধু ভাষারই ব্যবহার করেছেন। এখানে আমি তাঁর এই পর্যায়ের কবিতার ভাষা নিয়ে আলোচনা করছি।

ঈশ্বরগুপ্তের পারমার্থিক কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে তাঁর মনোভঙ্গির যে পরিচয় আমরা পাই তাতে দেখা যায় তাঁর প্রকাশের পক্ষে বাংলা ভাষার প্রচলিত রূপই যথার্থ ছিল। তাঁর স্টাইল হল পদ্যে ব্যবহারিক জীবন বর্ণনার উপযোগী চলতি গ্রাম্য দেশি বিদেশি শব্দ মিশিয়ে বাংলা বাগ্‌বিধিতে নির্ভর একটি জোরালো জীবন্ত ভাষার স্টাইল। এই রীতি তিনি সম্পাদকীয় গদ্য রচনাতে অনুসরন করেছেন।

খাঁটি বাংলা বাক্‌রীতির ব্যবহার তিনি করেছেন। এ বিষয়টি বাঙ্গালির নিজস্ব ভাষা প্রকৃতির বিশিষ্ট লক্ষণ। উনিশ শতকের গ্রাম্যতা বর্জনের সভ্য মার্জিত প্রবৃত্তি ছিল এর প্রধান কারন। তিনি ইডিয়মের ব্যবহার করেছেন। যেমন —

" জরা হতে মরা ভাল বেঁচে কিবা ফল " —

(জরা অপেক্ষা মরা ভাল)

" বিষয় বিষের কূপে ভব না রে মন ।

(মনের প্রতি উপদেশ)

" নদীছাড়া হও যদি খেয়ে আর দিয়ে " ।

(হিতমালা)

" জলে নাহি তেল মিশে " ।

(কিছু কিছু নয়)

পারমার্থিক কবিতাগুলির উৎকর্ষের কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের নিরাভরন ভাষা ও সহজ প্রকাশরীতি । তাঁর কবিতাগুলি যেন সদ্য খনি থেকে তোলা সোনা । আর্টের প্রক্রিয়া দ্বারা এই সোনাকে শোধন করা হয় নি । তাঁর এই শ্রেণীর কবিতা পাঠ করলে মনে হয় তিনি পাঠকের সঙ্গে কোন ব্যবধান - প্রাচীর টানেন নি । কবি পাঠকের সঙ্গে একই মাটিতে দাঁড়িয়ে পাঠককে তাঁর কবিতা শুনিয়েছেন । এটি তাঁর কবি কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে । কবিতার মধ্যে এই অকৃত্রিম সুরটি তিনি অব্যাহত রেখেছেন । মনে হয় এই বৈশিষ্ট্যটি তিনি কবিওয়ালাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন । তিনি কবির দলে গান বাঁধতেন , তাঁর কবিতাগুলি পাঠ করলে এ বিষয়টি অনুধাবন করা যায় । তাঁর গদ্য ভাষা বাংলার নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত , সংস্কৃত গদ্য ও ইংরেজি গদ্য থেকে তা দূরবর্তী । তাঁর গদ্য ভাষার ভিত্তি , বাংলা মৌখিক ভঙ্গিকে তিনি সংবাদ পত্রের উপ - যোগী করে গড়ে তুলে ছিলেন ।

ঈশ্বরগুপ্তের ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন – "সংস্কৃত ও ইংরেজি প্রভাবমুক্ত খাঁটি বাংলা অর্থাৎ মৌখিক ভঙ্গীর বাংলার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য :-

" তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি পদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃত জনিত কোন বিকার নাই – ইংরেজি-নবিশীর বিকার নাই। পান্ডিত্যের অভিমান নাই – বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না - সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বরগুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখেন নাই — আর শিখিবার সম্ভাবনাও নাই"। — (২)

এই পর্যায়ের কবিতায় পয়ার এবং ত্রিপদীর অলঙ্ঘনীয় শাসনে তাঁর কবিতাকে আবদ্ধ রেখেছেন।

পয়ার – স্বরূপ বিরূপ তাহা স্বরূপেই রয়।
আপনি বিরূপ হ'লে বিরূপ কি হয়।।
(মনের প্রতি উপদেশ)

---

(২) চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে) বসুমতী সাহিত্য মন্দির পৃ: ২২.

ত্রিপদী —

অখিল সংসার রচনা যাঁহার

সে জন কি গুন ধরে ।

নিয়মে সৃজন নিয়মে পালন

নিয়মে নিধন করে ।।

(ঈশ্বরের করুণা)

সংস্কৃত জটিল বাক্যবন্ধনের আদর্শ তাঁর মনে বিরাজ করতো তাই তিনি এত অনুপ্রাস অলংকার ব্যবহার করেছেন ।

যেমন —

এই হস্ত , এই পদ , এই আছে সব ।

এই এই , আর নেই , পরে এই শব ।।

(প্রণাম তোমায়)

গুরু গুরু গুরু গুরু , সকলেই কয় ।

গুরু রব গুরু বটে , ফলে গুরু নয় ।

(গুরু)

গুপ্তকবি সুকৌশলে নিজের নাম তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন ।

নশ্বর ঈশ্বর আমি , বুঝাইব কায় ।

ঈশ্বর যাবার নয় , ঈশ্বর কি যায় ?

(প্রার্থণা (১))

অথবা —

তুমি হে ঈশ্বরগুপ্ত , ব্যাপ্ত ত্রিসংসার ।
আমি হে ঈশ্বরগুপ্ত , কুমার তোমার ।।

(নির্গুন ঈশ্বর)

কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদ তিনি তাঁর পারমার্থিক ও নৈতিক পর্যায়ের কবিতায় ব্যবহার করেছেন । যেমন —

'জরা এসে শরীর করেছে অধিকার' । 'কালরূপ নিদাঘেতে খেতেছে জীবন' । 'তব ভাব দিক ছেড়ে অন্য দিকে ধাই নে ' । যাদমদে হয়ে মত্ত , আর যেন থাকিনে । ইত্যাদি । মধ্যযুগীয় শব্দের ব্যবহার তাঁর এই পর্যায়ের কবিতায় দেখা যায় —

ইথেই তোমার মনে , ইথে যদি অনায়াসে সুখে যায় দিন , হবে ইথে অপকার , ইথেই প্রবলরূপে প্রমাণ প্রকাশ ।

তৎসম শব্দের ব্যবহার তিনি পারমার্থিক ও নৈতিক কবিতায় প্রচুর করেছেন । — যেমন —

প্রভাকর, প্রভাত , বিভু, সিন্ধু অহং ,
নাট্যশালা , বিশ্ব , অনল , কুন্তল , সমীরণ ,
তনু , রসনা , চণক , চূর্ণ , বিহঙ্গম , নিধন , মকর ,
কুম্ভ , পরিহর , কায়া , নাশ ইত্যাদি ।

পারমার্থিক ও নৈতিক পর্যায়ের কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত ৮ । ৬ মাত্রার বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করেছেন কখনো ব্যবহার করেছেন ৮।৮।১০ মাত্রা , আবার ৬ । ৬।৮ মাত্রা ,

শারী শুক পড়ে যদি , মানুষের স্থলে , ৮।৬

রসনা পবিত্র করি , রাধাকৃষ্ণ বলে ।। ৮।৬ মাত্রা

মধুকর দলে দলে সেই কালি দলে দলে

কেলিরাম বলী বটে অলি ।। ৮।৮।১০ মাত্রা

বন দেখি ভাই শুনি আমি তাই

কি তোমার আছে পুঁজি । ৬।৬।১০ মাত্রা

যেমন — মায়াজাল , তত্ত্ব সুধারস , কুহক বাজী , ধরনাচল , খরধার , প্রেমরস , জীবন বিম্ব ইত্যাদি ।

পারমার্থিক ও নৈতিক পর্যায়ের কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন সাধুরীতির আবার কখনো কখনো ব্যবহার করেছেন কথ্য রীতির ।

সাধুরীতির ব্যবহার করেছেন , যেমন —

প্রণাম তোমায় , প্রার্থণা (২) , সাম্য , স্বায়ম্ভুব মনুর বিশুদ্ধদর্শন , সংসার জাঁতা , সংসার - সমুদ্র , সংসার কানন , সৎসঙ্গ , শরীর অনিত্য , রূপ ও গুণ , সাধু , রোজ সই , মনের মানুষ , নির্গুণ ঈশ্বর , বিভুর পূজা , পরমার্থ , সম্বন্ধ নির্দেশ , জীবের প্রতি , তত্ত্ব- প্রকরণ ইত্যাদি ।

কথ্য রীতি - প্রার্থণা (১) , মায়া , আর কিছু চাইনে , হৃদয়ের প্রতি ইত্যাদি ।

পারমার্থিক ও নৈতিক পর্যায়ের কবিতায় তিনি যে ভাষা বা শৈলী গঠন করেছেন অন্য পর্যায়ের কবিতায় তা করেন নি । তাঁর পারমার্থিক কবিতার বিশেষত্ব অন্য পর্যায় থেকে পৃথক ।

সামাজিক ও ব্যঙ্গ :-

সামাজিক ও ব্যঙ্গ পর্যায়ের ২৩ টি কবিতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে । এই কবিতাগুলির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিশক্তির সম্যক প্রকাশ ঘটেছে । রঙ্গপ্রিয়তা ও লঘুচপল ভঙ্গী এই শ্রেণীর কবিতাগুলির উৎকর্ষের কারণ । রসের মধুর আলাপের মধ্যে যেখানে সামাজিক অনাচার - ব্যভিচার , চারিত্র - দৈন্য , আদর্শহীনতা প্রকাশ পেয়েছে সেখানে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের হল ফুটিয়ে তিনি বাঙ্গালীকে সজাগ করে তুলতে চেয়েছেন । পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার অনুকরনেও নতুনত্বের আকর্ষণে বাঙ্গালী যখন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল , তখন তিনি সেই মোহগ্রস্ত উন্মত্ত সমাজ জীবনকে প্রকৃতিস্থ করার বিশাল দায়িত্ব নিজে নিয়েছিলেন । তাঁর এই কবিতাগুলি সংরক্ষনশীল মনের পরিচয় বহন করে । তাঁর সংরক্ষনশীলতা সব ক্ষেত্রে অন্ধ গোঁড়ামি হয় নি । শ্রী হীনতা , অশোভনতা যেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেখানেই তিনি শানিত কশাঘাত করেছেন । পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও ভাবধারার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তারই বর্ণনা রয়েছে এই কবিতাগুলিতে । এই কবিতাগুলিতে রয়েছে বিধবা - বিবাহ আন্দোলনে বিরোধিতা , কৌলীন্য - প্রথার অপকারিতা , খ্রীষ্টান - ধর্ম্মের ব্যাপক প্রসারে আশঙ্কা , বাঙ্গালীর সাহেবিয়ানা অনুকরন প্রিয়তা এবং দেশীয় আচার - প্রথা ও গুরু পুরোহিতে অবজ্ঞার জন্য ক্ষোভ , স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে সমাজে বিকৃতি ও প্রাচীন সনাতন স্ত্রী ধর্ম্ম লোপ পাওয়ার আশঙ্কা ।

দেশে ব্যাপকভাবে গো হত্যা ও তার জন্য দুশ্চাভাব , স্নানযাত্রা উপলক্ষে দেশীয় ধনী জমিদারের অনাচার ব্যভিচারের বর্ণনা , খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ , বাঙ্গালীদের প্রতি সাহেবদের উপেক্ষা , ইয়ং বেঙ্গলদের ক্রিয়াকলাপে অশ্রদ্ধা , নীলকর সাহেবদের অত্যাচার - অবিচার ।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলিকে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের সামাজিক ইতিহাস বলা যায় ।

'বিধবা বিবাহ আইন ' কবিতাটিতে আমরা দেখি ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা - বিবাহ আন্দোলনের প্রবল বিরোধিতা করেছেন এবং আন্দোলনের প্রবর্তক বিদ্যাসাগরের প্রতি বিদ্রুপের কশাঘাত করেছেন —

মিছা মিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হরা ।
মুখে বলা বলা নয় কাজে করা করা ।।
সকলেই তুড়ি মারে বুঝে নাক কেউ ।
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ ।।
সাগর যদ্যাপি করে সীমার লঙ্ঘন ।
তবে বুঝি হ'তে পারে বিবাহ - ঘটন ।।
নচেৎ না দেখি কোন সম্ভবনা আর ।
অকারণে হই হই উপহাস সার ।।

(বিধবা- বিবাহ আইন)

তাঁর মতে যুক্তি বিচার না করে শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করে বিধবা - বিবাহ আইন পাস করা হয়েছে —

শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে ।
দেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে ।।
যুক্তি বলে বিচার করুন শত শত ।
কোনমতে হইবে না শাস্ত্রের সম্মত ।।

(বিধবা - বিবাহ আইন)

প্রাচীন সংস্কার ও আচার - ব্যবহার তাঁর মনে ধ্রুব আদর্শ গড়ে উঠেছিল। যখনই তিনি সেই আদর্শচ্যুতির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছেন তখনই তিনি কটূক্তি করেছেন । তবে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া উচিৎ কিন্তু সেই পরিবর্তন বা উদারতা ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল না । বিধবা বিবাহ যদি প্রবর্তিত হয় তবে —" বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে । " সতী - নারীর মর্য্যাদা সম্পর্কে তাঁর মনে একটি স্থির আদর্শ ছিল এই সংস্কার ত্যাগ করে তিনি বিধবা - বিবাহ আন্দোলনে সম্মতি দেন নি । নারীর প্রতি সহানুভূতির অভাবই হ'ন এর কারণ ।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে সমাজে অনাচার ও ব্যভিচার প্রবল আকারে দানা বেঁধে উঠেছিল । দীর্ঘকাল থেকে যে উন্মত্ত প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজের অনুশাসন শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল , পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা সেই শৃঙ্খলকে শিথিল করে দিল । তখন সেই দীর্ঘ পুঞ্জীভূত উন্মত্ত প্রবৃত্তিগুলি বের হয়ে পড়ল । সেই যুগের বিচারে এই স্ফুরণ অস্বাভাবিক নয় ।

বিধবা - বিবাহ আন্দোলন সমাজে যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল সেটা কোন পর্যায়ে যেতে পারে সে বিচার করার দৃষ্টি শক্তি ঈশ্বরগুপ্তের ছিল না । তাঁর ভেতর আন্তরিকতা ও সমবেদনার অভাব ছিল তাই বাল - বিধবাদের দুঃখ তাঁকে বিচলিত

করে নি অথচ এই বাল - বিধবাদের দু:খে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কেঁদেছেন তাদের আবার বিয়ে দেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন । ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের এই বিদ্রুপের কারণ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — " যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয় , তাহা তাঁহার হয় নাই । যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয় , স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহভক্তি থাকিলে হয় , তাঁহার তাহা হয় নাই । স্ত্রী লোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র " । — (৩)

শৈশবে মাতৃস্নেহ এবং যৌবনে স্ত্রীর প্রেম থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন তাই হৃদয়ভাবের শিক্ষা তাঁর হয় নি । আর এ কারনে বিধবা - বিবাহ আন্দোলন তাঁর মনে প্রীতির রেখাপাত করে নি ।

বিধবা - বিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে বলেছেন —

মিছা কেন কুল নিয়া কর আঁটা - আটি ।
এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আঁটি ।।

একাধারে তিনি প্রাচীনকে অশ্রদ্ধা করেছেন আবার অন্যদিকে নবীনকে বাঁধা দিয়েছেন । তিনি জানেন " শতেক বিধবা হয় একের মরণে " । তথাপি তিনি বিধবা-বিবাহকে বিরোধিতা করেছেন । কৌলীন্য প্রথার ওপর তিনি কটাক্ষপাত করেছেন সুতরাং বিধবা - বিবাহ আন্দোলনকে তাঁর সমর্থন করা উচিৎ ছিল ।

---

(৩) চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র , ঈশ্বরগুপ্ত, ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে) বসুমতী সাহিত্য মন্দির পৃ : ৬.

বিধবা বিবাহ বা কৌলীন্যপ্রথা কোনটিই কবিকে অভিভূত করতে পারে নি। যদি কবি এদের কোনটির দ্বারা অভিভূত হতেন তবে এদের প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ না করে সমাধান করার চেষ্টা করতেন। তিনি হিউমারিস্ট বা স্যাটায়ারিস্টদের মত সমস্যাসংকুল বিষয়ের বর্ণনা বা চিত্রগুলিতে রঙ্গরসের ফুলঝুরি দেখিয়ে শেষ করেছেন যাতে পাঠক তার মধ্যে অভিভূত না হয়।

বাঙ্গালীদের অনুকরন প্রিয়তার জন্য তিনি ব্যঙ্গবান নিক্ষেপ করেছেন তাঁর "বড়দিন" কবিতায়। বাঙ্গালীরা যে সাহেবদের বড়দিন উৎসব অনুকরন করেন তার উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন –

এদিকে দু:খের দায় মনে বোলে ফাঁসী ।
বাহিরে প্রকাশ করে চরকীর হাসি ।।
ছেঁড়া পচা কামেজ তাহার নাই হাতা ।
তাই প'রে বাবু হন খানি করে মাথা ।।
ভাঙ্গা এক টেবিলেতে ডিস্ সাজাইয়া ।
ইশ্ ভাবে খানা খান বাহ্ বাজাইয়া ।।

পাঁচা কবিতায় তিনি বলেছেন –

রসভরা রসময় রসের ছাগল ।
তোমার কারনে আমি হয়েছি পাগল ।।
.....

চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া তুলে রাখি বুকে ।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই বোকা গন্ধ সুঁকে ।।
.....
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই সমুদয় নয়ে ।
হাড় শুদ্ধ গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে ।।
.....
মুখে বলি গঙ্গা - নারায়ণ - ব্রহ্ম - হরি ।
পাঁটা মাংস খেতে খেতে বিছানায় মরি ।।

কবিতাটিতে কেবল ছাগমাংসের প্রতি কবির লোলুপতার প্রকাশ পায় নি, পাঁঠার ওপর কবির আসক্তি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠার রূপ - মহিমা, অবয়ব, কণ্ঠস্বর সমস্তই চমৎকার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে ।

"হেমন্তের বিবিধ খাদ্য" কবিতায় কবি কেবল বিবিধ খাদ্য তালিকা ও তার গুনগানই করেন নি । মূলা - লাউ - ফুলকপি - পালং - শিম - পলান্ডু প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যকে রূপক কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করেছেন । কবি কল্পনা যে কত সূক্ষ এবং তাঁর রসবোধ যে কত প্রগাঢ় ছিল এই কবিতাটি তার সাক্ষ্য বহন করে । তিনি অভিনব উপমা ব্যবহার করেছেন –

যেমন —

সকল শরীর শোভে নিশির শিশির ।
ঋষির জটায় যেন মন্দাকিণী নীর ।।

পলান্ডুকে যুদ্ধের লস্করের সঙ্গে —

পলান্ডুর শ্রেণী যেন যুদ্ধের লস্কর ।
মুকুটের পর উড়ে মাথার উপর ।।

আমড়াকে সুবর্ণর সঙ্গে —

আমড়ার চামড়ার সুবর্ণের শোভা ।
সৌরভে আমোদ পেয়ে কথা কয় বোবা ।।

চালিতার রূপ এবং রসকে —

চালিতা পেকেছে গাছে হইয়া সরস ।
রূপে আর গন্ধে করে মোহিত মানস ।।

নোলেন গুড়কে —

নূতন নোলেন গুড়ে অমৃত যে খায় ।
রসের সাগরে তার মুখ ভেসে যায় ।।

পেস্তার মেঠাই এর সঙ্গে —

ভাজিলে সুস্বাদ আরো সোঁদা গন্ধ ছোটে ।
ভোজনের কালে মনে কত সুখ ওঠে ।।

ফুলকপিকে তুলনা করেছেন —

মনোহর ফুলকপি পাতা যুক্ত তায় ।
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায় ।।

আনারস কবিতায় তিনি বলেছেন —

সকল নয়ন - মাঝে রঙ আভা আছে ।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে ।।

এণ্ডাওয়ালা তপস্যামাছকে তিনি বলেছেন —

কম্বিত কনককান্তি কমনীয় কায় ।
গালভরা গোঁপ - দাড়ি তপস্বীর প্রায় ।।

উপমার এমন সুন্দর ব্যবহার তিনি করেছেন যাতে মনে হয় সাধারনের কাছে আকর্ষনীয় করা মূল কারণ এটিই । ঈশ্বরগুপ্ত এদের শুধু কবিতায় স্থান দেন নি । এদের সম্পর্কে সাধারণ বাঙালীর মনোভাবও প্রকাশ করেছেন ।

ফুলকপিকে বলেছেন —

সাহেবদের প্রেমডোরে চিরকাল বাঁধা ।

আঙুর সম্পর্কে বলেছেন —

সমাদরে রাখে তারে কৌটার ভিতরে ।
তুলার তোষক গদী করে থর থর ।।
তথাচ গলিয়া যায় এমন কোমল ।
রুচির রজত - রূপ করে ঝলমল ।।

এহেন উপাদেয় ফল অথচ সাধারণ বাঙালীর ক্রয় সীমার বাইরে । —

গরীবে জানে না নাম দূরে থাক মুট ।
দাম শুনে রাম বলে উঠে দেয় ছুট ।।

বাঙালীর মনের কথা তাঁর কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে তাই কবিতাগুলি পাঠকের কাছে আদরনীয় হয়ে উঠেছে । তাঁর এই জাতীয় কবিতায় একাধারে যেমন ভোজন রসিকতার পরিচয় মেলে তেমনি খাদ্যবস্তুকে যে কবিতার বিষয়বস্তু করে তোলা যেতে পারে তা ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা না পড়লে বোঝা যায় না ।

তিনি তাঁর "দুর্ভিক্ষ" কবিতায় স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন —

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো
ব্রত - ধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে ।
একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে ।
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে ।
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে ।
তখন 'এ বি' শিখে বিবি সেজে,
বিলাতি বোল কবেই কবে ।

"পৌষড়ার গীত" কবিতায় ভোজন বিলাসী ঈশ্বরচন্দ্র নিজেকে অনাবৃত ভাবে তুলে ধরেছেন । দেশে দুর্ভিক্ষ, অন্নাভাব, কবির অবস্থা ও সচ্ছল নয় তাই কবি আক্ষেপ করেছেন —

" এবার বছরকার দিন কপালে ভাই জুটলো নাকো পুলি পিটে " ।

এই বক্রোক্তি তখন হাস্যরস হয় নি এটা হয়ে উঠেছে তিক্ত রস । আর এই হাস্যরস বা ব্যঙ্গ রসে কবি অলংকার ব্যবহার করেছেন Pun । হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতায় Pun এর ব্যবহার সার্থক ।

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় কবির সত্যিকারের সার্থকতা লুকানো আছে তাঁর এই সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতাগুলির মধ্যে । এই কবিতা - গুলির মধ্যে কবি হয়ে উঠেছেন সহজ ও স্বাভাবিক । মূলত : তিনি বর্ণনাধর্মী ও ব্যঙ্গ - রসাত্মক কাব্যের স্রষ্টা এবং বস্তুমুখীন ও সমাজকেন্দ্রিক কবি ।

ঈশ্বরগুপ্তের কৌতুক-প্রিয়তা লক্ষনীয় —

সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি ।

নসী , যশী , ফেমী , রামী , যামী , শ্যামী গুল্কি । কবির নাম - করনের চাতুর্য সত্যিই লক্ষনীয় । (ইংরাজী নববর্ষ) ।

নব্য বাঙালীরা যখন সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরন করেছেন কবি তাদের প্রতি তীব্র বিদ্রুপ বা ব্যঙ্গবান নিক্ষেপ করেছেন । মহারানীকে স্তুতি করতে গিয়ে দেশী Agitator দের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন ।

মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু

শিখিনি সিং বাঁকানো ,

কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস ।।

যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা

গামলা ভাঙ্গে না ,

আমরা তুসি পেলেই খুসি হব

ঘুসি খেলে বাঁচব না ।। (নীলকর)

সাহেব বাবুদের বিদ্রূপাত্মক ভাষায় বলেছেন : -

যখন আসবে শমন কোরবে দমন

কি ব'লে তায় বুঝাইবে ।

বুঝি 'হুট্' বলে, 'বুট' পায়ে দিয়ে

"চুরুট" ফুঁকে স্বর্গে যাবে ।

পাশ্চাত্য উগ্র সাহেবিয়ানা কবিকে ব্যথিত ও মর্মাহত করেছে ।

ব্যঙ্গের সুনিপুন শব্দগ্রন্থিতে "ইংরাজী নববর্ষ" কবিতায় অনুপ্রাস অলঙ্কারের মাধ্যমে সাহেবদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন —

গিন্নী সম্পর্কে বলেছেন —

কাছেতে দাঁড়ালে পরে

"ডাক্‌রা বুড়ো ন্যাকরা করিস্"

বলে দেবে খ্যাংরা পিটে ।

এ গিন্নীর কাছে পিঠা - পুলির আব্দার আশা করা যায় না । জ্ঞাতি - কুটুম্বদের আর্থিক অবস্থা ও ভাল নয়, তাদের বাড়ি গিয়েও সুবিধে হবে না। যাদের ঘরে লক্ষী আছে তাদের বাড়িতে গেলে কবিকে কেউ একটি বার মুখটি ফুটে খাওয়ার কথা বলে নি । তাই কবির নিজ জাতির প্রতি ও বিতৃষ্ণা জন্মেছে । নগর পরিভ্রমন করে কবি আশানুরূপ অভ্যর্থনা কোথাও পান নি । কাহারও বাড়ি থেকে "লুচিপুচি" আনা যায় না । তাই তিনি অভিনব উপায় বের করে সান্ত্বনা পান —

নিমন্ত্রনে যাবে যারা ,
আমার হয়ে খাবে তারা
মনকে আমি প্রবোধ দেবো
হাত বুলিয়ে তাদের পেটে ।

পিঠা - পুলির জন্য কবির দুর্দমনীয় লোভ , দুর্জয় অভিযান কল্পনা , অপূর্ব ভাষায় কবি প্রকাশ করেছেন । এটি ঈশ্বরগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা ।

সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতায় দেখা যায় কবি যে ভাবে পারমার্থিক ও নৈতিক কবিতাগুলি শিখেছেন তাঁর চেয়ে এই পর্যায়ের কবিতাগুলির শৈলী পৃথক । এ কবিতাগুলিতে ব্যঙ্গ রস নেই কেবল আছে অনাবিল হাস্যরসের খোরাক । " এডারওয়ালা তপস্যামাছ " বা " পাটা " কে তিনি যে ভাবে অভিহিত করেছেন তার মধ্যে তিক্ততাহীন , হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা পাওয়া যায় । আবার " বড়দিন " কবিতায় তিনিই বক্রোক্তি করেছেন তাদের খাদ্য নিয়ে ।

" পঁইখাড়া চিঙড়ির ক'রে ভুষ্টিনাশ ।
মেম সঙ্গে নানা রঙ্গে গরিমা প্রকাশ । "

নৃত্যগীতকে কৌতুকপূর্ণ চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন —

কট্ কট্ কটাকট্ টক্ টক্ টক্ ।
ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ ।।
চুপ্ চুপ্ চুপ্ চুপ্ চপ্ চপ্ চপ্ ।
সুপ্ সুপ্ সুপ্ সুপ্ সপ্ সপ্ সপ্ ।।

(ইংরাজী নববর্ষ)

সামাজিক ও ব্যঙ্গ পর্যায়ের কবিতায় দেখা যায় যে ঈশ্বরগুপ্ত দলমাত্রিক ছন্দ ব্যবহার করেছেন । তাঁর "নীলকর" কবিতায় পাঁচটি গীত আছে এবং দুর্ভিক্ষ কবিতায় দুটি গীত আছে । কবিতাগুলি রামপ্রসাদী দলমাত্রিক ছন্দে লেখা । কবিতাদুটি চলতি ভাষায় লেখা ।

নামেতে নীলের কুঠি হ'তেছে কুটি কুটি
দুখী লোক প্রাণে মারা যায় ।
পেটে খেতে নাহি পায় ।
কুঠেল সব শাহেব জাদা ধপ্‌ধপে বাইরে সাদা
ভিতরে পচা কাদার ভড় ভড়ানি
পোঁকা গন্ধ তায় ।

ঈশ্বরগুপ্ত সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতাতে ইডিয়মের ব্যবহার করেছেন ।

"ছোঁড়া বড় ঠাটা" — পৌষ পার্বন
"দুই চক্ষু রেঙ্গে" — ।।
"তোমার কি ঘরপানে কিছু নাই টান"— ।।
"জানেন কিঞ্চিত গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী"— পাঁটা

"আগে পাছে পাকা পাকি ।
আঁকা আঁকি তাকাতাকি" — স্নানযাত্রা ।

"এত ভর্ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা"— পৌষ পার্বন । ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালীর ঘরোয়া চলতি ভাষাকে তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছেন । —

আদ্‌পেটা ভাত কদিন খাবো ,
দু'দিনেই ত' ম'রে যাবো ,
পেটের জ্বালায় জ্বলে বুঝি ,
বেচতে হলো কোটা - ভিটে ।। —

পৌষড়ার গীত

আবার ,

নিত্যি আনে নূতন কড়ি ,
ভেট্‌কি মাছে কুমড়ো বড়ি ,
জোৎ কুটুম্ব ছড়াছড়ি ,
গড়াগড়ি দিচ্ছে গেটে ।।

সামাজিক ও ব্যঙ্গ পর্যায়ের কিছু কিছু কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত ইংরাজী শব্দের ব্যবহার করেছেন । তিনি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের যোগ্য শিষ্য । সমকালীন ইঙ্গ বঙ্গ সমাজে আরবী - পার্শীর সঙ্গে বহু ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেছেন , —

ওল্ড এক টেষ্টমেণ্ট গোল্ড তায় বাধা ।
কোল্ড ক'রে মানুষেরে লাগাইয়া ধাঁধা ।।

— বড়দিন

অথবা —

কাউন্সিল কোচের গৃহে বড় সমাদর ।
অনুরক্ত ভক্ত তব যত গবানর ।।

(বুড়ো শিবের স্তুতি)

অথবা —

টেক্ ফিস বলে ডিস কাছে দেয় ঠেলে ।
সশরীরে স্বর্গভোগ এঁটো খেতে পেলে ।।

(এডাওয়ালা তপস্যামাছ)

ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতায় বিরামচিহ্ন ব্যবহার করেছেন ৮।৬ মাত্রার পর কখনো বা ৮।৮।১০ মাত্রার পর । যেমন —

আনাদরে আনা যায় কত আনারস । ৮।৬
অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ ।।

(আনারস)

অথবা —

স্নানযাত্রা প্রতি বর্ষে এইদিন মহা হর্ষে
মেলা পেয়ে করে সব খেলা ।। ৮।৮।১০

(স্নানযাত্রা)

ঈশ্বরগুপ্ত শব্দান্ত ব্যঞ্জন ও স্বরের মিলকে আদর্শ মনে করতেন না । কবিওয়ালাদের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য । দ্বিমাত্রিক শব্দ তিনি দেখিয়েছেন । মর্ম - কর্ম - ধর্ম , কামিনী - ভামিনী এ জাতীয় মিল তাঁর কবিতায় দেখা যায় । জোড়া মিল ও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় —

পিঠে পুলি , ছিটে পুলি ।

ক্রিয়াপদের মিল তাঁর কবিতায় প্রচুর রয়েছে —

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল ।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল ।। (বিধবা বিবাহ)

অথবা —

সাগর - সলিলে হয় বিবাদ বিস্তার ।

গড়াগড়ি ছড়াছড়ি সুধার সুধার ।।

(এডাওয়ালা তপ্যামাছ)

উচ্চারনানুগ বানানের দিকে কবি লক্ষ্য রেখেছেন —

যেমন —

চুনচে , গুনচে , বুনচে , দর্ , চল্‌বো , ওলট্ - পালট্

বর্ষ , হর্ষ , ভাগ্‌গি , মাগ্‌গি , হিন্দু মোছোলমান , মাগী ,

খাগী ইত্যাদি । ঠিক ভাবে বোঝাতে সঠিক শব্দ তিনি ব্যবহার করতে ।

সেই শব্দ বা বানান সাহিত্যে আদৌ গ্রাহ্য হবে কি না তা ভাবতেন না ।

এই সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতাতে তিনি যমক অলংকার ব্যবহার করেছেন ।

ইচ্ছা করে কাঁচা খাই সমুদয় নয়ে ।

হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে ।। (পাঁটা)

'হাড়গিলে ' শব্দটি দু অর্থে ব্যবহার করে কৌতুক রস সৃষ্টি করেছে ।

বাগ্‌ভঙ্গিমা ও তির্যক —

পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে ।

বাপ পূজে ভবতী বেটা দেয় পেটে ।।

(আচার ভ্রংশ)

এই পর্যায়ের কবিতায় কবি প্রায় প্রতিটি সমাসেরই ব্যবহার করেছেন ।

কোথাও তিনি ব্যবহার করেছেন সাধুরীতি আবার কোথাও কথ্যরীতি ।

সাধুরীতি — ইংরাজী নববর্ষ, বিধবা বিবাহ, বিধবা-বিবাহ-আইন, পাঁটা, স্নানযাত্রা, এডাওয়ালা তস্যামাছ, হেমন্তে বিবিধ খাদ্য, তোষামুদে ইত্যাদি ।

কথ্যরীতি — পৌষ-পার্ব্বন, ছদ্ম-মিশনরি, নীলকর, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ।

সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতাগুলিতে উচ্চতর রসবিচারে মূল্য না পেলেও কাব্যশিল্প হিসেবে এর একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। এই রঙ্গ - কৌতুক ঈশ্বরচন্দ্রের বিষয় - পরিবেশনের ফর্ম বা প্রণালী। কবিওয়ালাদের কাছ থেকে নেওয়া হলেও এই ফর্ম তাঁর নিজস্ব। হাস্যরসপূর্ণ বাগ্‌ভঙ্গিমা তাঁর কবিতার টেকনিক ছিল। "তারা হুট করে বুট পায়ে দিয়ে চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে" । এই "হুট" এবং "বুট" দুইটির মধ্যে যে উইট তিনি সৃষ্টি করেছেন তা কবির লড়াইয়ের উপযোগী ছিল ।

এতকাল ঈশ্বরগুপ্তের মাত্র কয়েকটি কবিতা প্রচলিত ছিল। এর থেকে তাঁর মানস প্রকৃতিটিকে আমরা একভাবে বুঝেছিলাম। এখন গবেষণা করার সময় তাঁকে নতুন ভাবে বুঝতে হচ্ছে । তৎকালীন আধুনিক কলকাতা ঈশ্বরগুপ্তের রঙ্গ প্রিয় মনকে নানা কৌতুক রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের কবিতাবলীকে সংকলিত করার সময় এই সামাজিক ও ব্যঙ্গ পর্যায়ের কবিতাগুলিকে বেছে নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান দিলেন। লেখার কাল অনুযায়ী পারমার্থিক ও নৈতিক কবিতাগুলি আগে লেখা, গুনগত বিচার করে বঙ্কিমচন্দ্র এদের কাব্যগ্রন্থের প্রথমে স্থান দেন ।

তিনি জানতেন এই সামাজিক ও ব্যঙ্গ পর্যায়ের কয়েকটি কবিতা কুরুচিপূর্ণ ভাষায় লেখা । তাঁর এই সকল কবিতা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট । কারণ কবিওয়ালা তখন সমাজে বাস করছিল । তিনি তাদের সঙ্গে মানিত হচ্ছিলেন তাই তাদের প্রভাব তাঁকে প্রভাবিত করেছিল ।

তিনি কবিওয়ালাদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর কবিতা তিনি নিজস্ব শৈলীতে লিখেছেন । উনিশ শতকের প্রথমে যে কাব্য গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাঁদের অনেকেই ঈশ্বরগুপ্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । মধুসূদন ছাড়া তাঁর সমকালীন কবিরা সকলেই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতা অনেক কবিই লিখেছেন তবে ঈশ্বরগুপ্তের মত সরলপ্রাণ ও বাস্তববাদী কেউ হতে পারেন নি ।

রসাত্মক কবিতা : -

ঈশ্বরগুপ্ত কিছু রসাত্মক কবিতা লিখেছেন । এই কবিতাগুলি প্রেম ও প্রণয়মূলক কবিতার সমষ্টি । এই শ্রেণীর কোন কোন কবিতায় গীতিকাব্য সুলভ ভাব প্রকাশিত হয়েছে । কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির অভাব এবং মন বহির্মুখী হওয়ায় এ জাতীয় কবিতাগুলিতে খাঁটি গীতি কবিতার পরিচয় পাওয়া যায় না । কবি নিজের চিত্তের সীমাবদ্ধতার প্রবনতার জন্যই রসাত্মক কবিতার বেশীর ভাগ কবিতাতেই কৃষ্ণ ও রাধিকাকে নায়ক ও নায়িকা করে প্রেম ও প্রনয়াসক্ত চিত্তের ব্যথা ও বেদনা - বিষাদ

আনন্দ বর্ণনায় ব্রতী হয়েছেন । ফলে লেখকের নিজস্ব ভাবাবেগের পরিচিতি আর রাখতে পারেন নি । ঈশ্বরগুপ্তের এই রসাত্মক কবিতার মাঝে মাঝে anticlimax এর স্পর্শ থাকায় তাঁর কবিতাগুলিতে lyricism অনেক জায়গাতে ব্যাহত হয়েছে । রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটেছে । Anticlimax তাঁর কবিতাতে স্বভাবশত ই প্রবেশ করেছে এবং বিরোধসৃষ্টি করেছে । দু - একটি রসাত্মক কবিতা এই anticlimax থেকে মুক্ত , যেমন – " প্রেম নৈরাশ্য " এবং " প্রণয় " । এই কবিতাগুলিকে আধুনিক কবিতার সূত্রপাত বলা যেতে পারে । কবিতা দুটি ত্রিপদী ছন্দে রচিত । এই কবিতাগুলি পাঠ করলে মনে হয় কবি যেন বৈষ্ণব কবিতার ধারাকে অব্যাহত ভাবে বহন করে চলেছেন যেমন করেছেন ভারতচন্দ্র । এই শ্রেণীর কবিতা সংখ্যায় খুবই কম সুতরাং এই কয়েকটি কবিতা পাঠ করে কবির প্রবণতার যথার্থ বিচার করা যায় না । এ গুলিকে মনে হয় কবির স্বাভাবিক প্রবণতার ব্যতিক্রম ।

গুপ্ত কবির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা মধুর সম্পর্ক ছিল । ১৮৫২ সাল থেকে " সংবাদ প্রভাকরে " বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা ছাপা হতে থাকে । বিষয়বস্তু এবং রচনা কৌশলের দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন কবিতায় ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব দেখা যায় । এই শ্রেণীর অধিকাংশ কবিতাই আদি রসাত্মক ।

প্র শ্ন

ঈশ্বরগুপ্ত – বলনা বলনা প্রাণ ললিত - নয়নি ।
নলিনী মলিনী কেন করে সে রজনী ?

উত্তর

যে রূপ স্বভাব যার সে চায় সে রূপ ।
শক্তির বিস্তার করে করিতে স্বরূপ ।
তিমিরে ত্রিলোক পূর্ণ পূর্ণ করে যেই ।
তামরসে তমোরাশি দান করে সেই ।।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের "প্রীতি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর" অনুসরনে লিখেছেন — নারী

কেন কেন কান্ত হয়েছে একান্ত
নীরব কোকিল কুল ।
কি হেতু চলনা না করে কলনা
হিয়ে কেন প্রতিকূল ।।

পতি

শুন প্রাণ বলি কোকিল কাকলী
যে হেতু হইল হারা ।
মধু স্বরে তা হইয়ে নীরব
তোমারে কাঁদিছে তারা ।।

ঈশ্বরগুপ্তের এ জাতীয় প্রশ্নোত্তর মূলক ঈষৎ আদিরসাশ্রিত রচনা "হাসি হাসি মুখ" ? — নায়কের উক্তি কিশোর বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল । এ জাতীয় আদিরসাত্মক কবিতায় তিনি একাধারে ঈশ্বরগুপ্তের আদর্শকে অনুসরন করেছেন অন্যাধারে ভারতচন্দ্রের প্রভাবকেও স্বীকার করেছেন । যথা —

"যথা যাব তথা রব প্রেম ডোরে বাঁধা তব ,
অন্তরে অন্তরে বাধা প্রনয়ের পাশে লো ।
স্বপনে নয়নে মনে হেরিলে সে চন্দ্রাননে
হেরিব সে বিধুমুখ মৃদু মৃদু হাসে লো " ।

এই "হাসি হাসি মুখ ? " কবিতায় কবির নিজস্ব চিত্তের ভাবাবেগ নায়িকার মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন । এখানে নায়কের প্রতি নায়িকার খেদ প্রকাশ পেয়েছে । মূলত । এখানে রাধিকার খেদই ব্যক্ত হয়েছে ।

"নায়কের উত্তর " কবিতায় নায়িকার খেদোক্তিতে নায়ক বাঁকা মুখে উত্তর করেছে যে নায়িকা তার ভাবকে যমের মত বুকে করে রক্ষা করেছে । এটাই নায়কের মনের খেদ ।

"শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন " কবিতায় দেখা যায় বৃন্দাবন থেকে দ্বারকায় এসে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধিকার স্মৃতির ভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছে এবং রাধিকার জন্য হাহাকার করছে ।

"কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা " কবিতায় দেখা যায় রাধিকা আয়ানের স্ত্রী হয়েও কৃষ্ণের প্রতি প্রেমাসক্ত এবং কৃষ্ণের বাঁশী শুনে সে আয়ানের ঘর থেকে ছুটে এসেছে ।

"সখীর প্রতি রাধিকা " কবিতায় দেখি রাধিকা তার সখীর কাছে শ্যামের রূপের বর্ণনা করেছে এবং সে তাতে মুগ্ধ তার বর্ণনাও রয়েছে ।

"মানভঞ্জন " কবিতায় দেখি নায়ক নায়িকার মান অভিমানের শেষে তা ভঞ্জন হয়েছে । মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র "বর্ষার মানভঞ্জন " কবিতাটি এই "মানভঞ্জন " কবিতার অনুকরনে লিখেছিলেন ।

"ভালবাসা" কবিতায় বহুদিন পর নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎ হলে দীর্ঘ অদর্শনে উভয়ের অনুভূতি উভয়ের কাছে ব্যক্ত করেছেন কবি ।

এই রসাত্মক পর্যায়ের কবিতা ঈশ্বরগুপ্তের অন্যান্য কবিতা হতে পৃথক । সামাজিক ও ব্যঙ্গ পর্যায়ে কবির যে মানসিকতার পরিচয় আমরা পেয়েছি, এই পর্যায়ের কবিতায় এসে দেখি এখানে কবি পুরোপুরি পালা বদল করেছেন । মনে হয় কবি এখানে কৃষ্ণ ও রাধিকার মুখ দিয়ে নিজের কথাই বলতে চেয়েছেন । কারণ আমরা জানি কবিতা হল কবির মনের দর্পণ । সামাজিক ও ব্যঙ্গ পর্যায়ের তীব্র বক্রোক্তি বা তিক্ত রসের কোন স্পর্শ এই পর্যায়ে নেই । এখানে কবি প্রেমরসে সিক্ত ।

রসাত্মক শ্রেণীর কবিতায় ঈশ্বরগুপ্তের শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয় । কোন নতুন ধরনের শব্দ তিনি এই শ্রেণীর কবিতায় ব্যবহার করেন নি । মাঝে মাঝে কিছু শুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেছেন । যেমন — উথলয়, নিরাখি, ছাঁদ, তনু, পাশিয়া, উপজে, বিদরে, ঠারি, উমেদার, উপে ইত্যাদি ।

এই শ্রেণীর কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ কয়েকটি ব্যবহার করেছেন।

কি হাস হাস কি ভাষ ভাষ , (৪)

কি ছল ছল কি বল বল , (৫)

কি হাঁক হাঁক কেন হে ডাক , (৬)

---

(৪) ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা পৃ : ১১১.

(৫) তদেব

(৬) তদেব

খেদ - ছলে রব সাঁই সাঁই , (৭)

রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে আছি মিশাইয়া । (৮)

সমধাতুজ কর্ম কয়েকটি তিনি এই শ্রেণীর কবিতায় ব্যবহার করেছেন তবে তা সংখ্যায় খুব কম । যেমন –

ছাঁদ ছাঁদিয়াছে , ভাষ ভাষিতেছে ।

সুরের মিল আমরা রসাত্মক কবিতায় দেখতে পাই যেমন – নলিনী মলিনী, মরুক মরুক , অমল কমল , ছলেছি বলেছি ইত্যাদি ।

ঈশ্বরগুপ্তের রসাত্মক কবিতায় আমরা কিছু ইডিয়মের ব্যবহার লক্ষ্য করি ।

ক) যে দেহে ফুলের ভার সহনীয় নয় ।
রতনের আভরন সে দেহে কি সয় ? (৯)

খ) লজ্জাহীনা পঙ্কজিনী নায়িকা অধম্যা । (১০)

গ) ভাবেতেই বোঝা যায় ভিতরের ভাব । (১১)

ঘ) কিছুতে নারীর মন নাহি হয় বশ । (১২)

---

(৭) ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী , বসুমতী সাহিত্য মন্দির , মানভঞ্জন , পৃ: ২০১.

(৮) তদেব পৃ : ২১০.

(৯) তদেব পৃ : ২০৯.

(১০) তদেব , 'প্রীতি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর' পৃ: ২১২.

(১১) তদেব , 'প্রণয় গর্ভমান ' পৃ : ২১২.

(১২) তদেব, "নায়কের উত্তর ' পৃ : ২১৬.

রসাত্মক পর্যায়ের কবিতায় কবি কোথাও ব্যবহার করেছেন দীর্ঘ ত্রিপদী আবার কোথাও ব্যবহার করেছেন পয়ার ছন্দ ।

যেমন —

ক) যার তরে আকিঞ্চন করিয়া কাতর মন
এ অবধি না হইল স্থির ।
তাহারে এখনো আর আশা আছে পাইবার
আরে মুগ্ধ মানস অধীর ।
(প্রেম নৈরাশ্য) (১৩)

খ) বলনা বলনা প্রাণ ললিত - নয়নি
মলিনী মলিনী করে করে সে রজনী ?
(প্রীতি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর) (১৪)

এই পর্যায়ের কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি যে কবি এখানে উত্তর প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে কিছু কবিতা রচনা করেছেন । যেমন – " প্রীতি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর " কবিতায় দেখা যায় ।

নায়কের মনোভাবকে প্রশ্ন করে নিজের মুখ দিয়েই তার উত্তর রচনা করেছেন । " হাসি হাসি মুখ " কবিতায় কবি নায়িকার উক্তির মাধ্যমে তার মনের খেদ ব্যক্ত করেছেন আবার " নায়কের মুখ " কবিতায় কবি বাঁকা মুখ করে উত্তর দিয়েছেন । এই উত্তর প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে কবিতা রচনা করে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ।

---

(১৩) তদেব , 'প্রেম নৈরাশ্য ' পৃ : ১২৫.

(১৪) তদেব , " প্রীতি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর " পৃ : - ২১১.

রসাত্মক পর্যায়ের কবিতায় কবি কোথাও ব্যবহার করেছেন যমক অলংকার আবার কোথাও অনুপ্রাস অলংকার ।

যমক –

কামিনীর সুবাসে কামিনী মন হরে ।
কামিনী কামিণী আশা আপনিই করে ।। (১৫)

প্রাণকান্তে প্রাণকান্তে ত্যজিছ মনের ভ্রান্তে
আমি যাই ধর ধর স্বামী । (১৬)

অনুপ্রাস –

মধু পেয়ে মধুফুলে মধু খেয়ে মন খুলে,
মধুরবে করে এই গান ।

মধুর মধুর কাল, মধুর প্রণয় ভাল
বধূমুখে মধু কর পান । (১৭)

ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর রসাত্মক শ্রেণীর কবিতায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করেছেন ৮।৮।১৫ মাত্রায় কোথাও ৮।৮।১০ মাত্রায় আবার কোথাও ৬।৬।৮ মাত্রায় কোথাও ৮।৬ মাত্রায় ।

---

(১৫) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে) বসুমতী সাহিত্য মন্দির, 'মানভঞ্জন' পৃ : ২০০.

(১৬) তদেব, পৃ : ২০১.

(১৭) তদেব, পৃ : ২০০.

যেমন –

ক) নিরুপম অপরূপ , নিবিড় নীরদ রূপ ,
নিয়তে নিরখি সখি নয় নিকটে গো । ৮।৮।১৫
(১৮)

খ) বহুদিন যার লাগি হয় প্রেম অনুরাগী
আশা পথে আশা ছিল একা । ৮।৮।১০
(১৯)

গ) পতির সুভাষে সতী মনে হাসে
ভাব না প্রকাশে মুখে । (২০) ৮।৮।৬

ঘ) বিনোদ বেশর চারু নাসিকায় দোলে । ৮।৬
চকোর শোভিত যেন পূর্ণশশি কোলে ।। (২১) ৮।৬

রসাত্মক শ্রেণীর কবিতায় কবি কোথাও ব্যবহার করেছেন সাধুরীতির আবার কোথাও ব্যবহার করেছেন চলিত রীতির ।

যেমন –

ভূতলে পোড়েছ কনকলতা ।
কাতর দেখিয়া না কহ কথা ।।

---

(১৮) ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী , (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে) বসুমতী সাহিত্য মন্দির, সখীর প্রতি রাধিকা পৃ : ২০০.

(১৯) তদেব , 'প্রণয় ' পৃ : ১৯৬.

(২০) তদেব , 'মানভঞ্জন' পৃ : ২০৬.

(২১) তদেব , 'মানভঞ্জন ' পৃ : ২০৩.

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে এতদিন আমরা যা জেনেছি এই পর্যায়ের কবিতা পাঠ করার পর স্বভাবতই মনে হয় কবির ও একটি আবেগ প্রবন মন ছিল এবং কবি তাকে কৃষ্ণ ও রাধিকার ওপর আরোপ করেছেন । তাঁর এই রসাত্মক শ্রেণীর কবিতা অন্যান্য কবিতার ব্যতিক্রম ।

" দ্বিতীয় যুদ্ধ " কবিতায় শিখদের বিরুদ্ধে ইংরাজদের পক্ষ কবি অবলম্বন করেছেন । ভারতবাসীকে যুদ্ধ করার জন্য তিনি উৎসাহিত করেছেন —

ভারতের অবোধ দুর্ব্বল লোক যত ,
ডাল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত ?
পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর ।
রাজার সাহায্য হেতু রনসজ্জা কর ।।
লাহোরের শিখ - সেনা শত্রু অতিশয় ।
এখন আলস্য করা সমুচিত নয় ।। (দ্বিতীয় যুদ্ধ)

" দিল্লীর যুদ্ধ " কবিতায় ভারতবাসীকে ব্রিটিশের জয়ে উল্লসিত হবার জন্য উৎসাহিত করেছেন —

ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয় ।
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিসের জয় ।। (দিল্লীর যুদ্ধ)

ঈশ্বরগুপ্তকে আমরা প্রকৃত অর্থে দেশ প্রেমিক আখ্যা দিতে পারি না । দেশাত্ম - বোধের জীবন্ত উদাহরণ তাঁর হাতে থাকলেও তিনি তা ব্যবহার করেন নি পরন্তু ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে তাদের বিজয়ে উল্লসিত হয়েছেন ।

সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি যুদ্ধবিষয়ক ঘটনাগুলি সংগ্রহ করে যুদ্ধ - বিষয়ক কবিতাগুলি রচনা করেছেন । শিখ যুদ্ধকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

" লিখিতে উদার দুঃখ লেখনীর মুখে ।
সেনের মরণগুলি , শেল ফুটে বুকে ।।
এটি কম্প , ছেড়ে কম্প , অস্ত্রধরি বলে ।
মরিলে শীকের যুদ্ধ , সময়ের স্থলে ।।
হায় হায় এই দুঃখ কি সে হবে দূর ।
বৃটিশের রক্ত খায় শৃগাল কুক্কুর ।। (২২)

সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ছোট বড় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল । এই সব যুদ্ধে কখনো জয়লাভ করেছে ব্রিটিশ , কখনো দেশীয় সৈন্যদল কবি ব্রিটিশের পরাজয়ের কথা তাঁর কবিতায় লিখেছেন । ইংরেজ রাজত্বে বাস করে তিনি লিখেছেন — " ব্রিটিশের রক্ত খায় শৃগাল কুক্কুর " । ঈশ্বরগুপ্তের নির্ভীকতা , তেজস্বিতা এবং দৃঢ় মনোবলের প্রকাশ এই নিদর্শনের মধ্য দিয়ে নির্দেশিত হয়েছে । এ নিদর্শন বিরলদৃষ্ট ।

বৃটিশের যখন জয় হয়েছে তিনি তাদের জয়েরই ঘোষণা করেছেন ।

" রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয় " —

(শিখ যুদ্ধে ইংরেজের জয়)

---

(২২) বসু সঞ্জীব , ঈশ্বরগুপ্ত , ঈশ্বরগুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য , সংস্কৃতি প্রকাশন , আগষ্ট ১৯৬৪ , পৃ : ১১৬.

সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি লিখেছেন — শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়, দ্বিতীয় যুদ্ধ, যুদকির যুদ্ধ, শিখ যুদ্ধ, ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়, কানপুরের যুদ্ধে জয়, দিল্লীর যুদ্ধ, এলাহাবাদের যুদ্ধ, কাবুলের যুদ্ধ, ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম, আগরার যুদ্ধ ।

সমাজচেতনা তার কাব্যের মূল বিষয় বা পটভূমি । রাষ্ট্রবিপ্লব যদি তাঁর সময়ে না হতো তবে তার চিত্র আমরা তাঁর কবিতায় পেতাম না এবং তাঁর কবিতা সংখ্যাও কম হতো । ঈশ্বরগুপ্ত প্রথম বাঙ্গালী কবি যিনি সমসাময়িক যুদ্ধকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন।

যুদ্ধবিষয়ক কবিতাতে ঈশ্বরগুপ্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করেছেন । যেমন —

হুড় হুড় হুড় হুড় দুড় দুড় দুড় দুড়

গুড় গুড় গুড় গুড় গুম ।

কড় কড় চড় চড় খড় খড় ফড় ফড়

হড় হড় দড় দড় দুম ।

ইংরাজী শব্দ ঈশ্বরগুপ্ত এই শ্রেণীর কবিতায় ব্যবহার করেছেন —

ক) "রেজিমেন্ট করে সেন্ট তাঁবু টেন্ট ফেলে" ।।

খ) ধন্য চিফ কমান্ডার ধন্য দেও নর্ডে ।

ইংরাজের র‍্যাঙ্ক বাড়ে থ্যাঙ্ক দেও গড়ে ।।

গ) ফায়ের ফায়ের ফুট ফাই ফাই ভুট হুট

ড্যাম ড্যাম গোরাগন ডাকে ।

হিন্দী শব্দ এই জাতীয় কবিতায় লক্ষ করা যায় —

কাঁহা যাগা আখি তেরা শেরা লেগা
সেফায়েরা এই রব হাঁকে ।

ইডিয়মের ব্যবহার যুদ্ধবিষয়ক কবিতায় প্রচুর পরিমানে দেখা যায় ।

যেমন —

ক) "পেটে খেলে পিঠে সয় " । (দ্বিতীয় যুদ্ধ)

খ) " একা রামে রক্ষা নাই , সুগ্রীব তার মিতে " ।
(কানপুরের যুদ্ধে জয়)

গ) "অধর্ম্ম বৃক্ষেতে ফল ফলে হাতে হাতে " । (")

ঘ) "কর্ম্ম - দোষে ধর্ম্ম - দোচে , অধঃপাতে যাবে । (")

ঙ) "পিপীড়া ধরেছে ডানা , মরিবার তরে " । (")

সুরের মিল আমরা যুদ্ধবিষয়ক কয়েকটি কবিতায় দেখি —

ক) পড়ুক বিপক্ষদল মনের অনলে ।
উড়ুক ব্রিটিস - ধ্বজা সমুদয় স্থলে ।।

খ) ধড়ুক ধড়ুক ক'সে তোপ দিলে জেগে ।
ভড়ুক ভড়ুক সব ভয়ে গেল ভেগে ।।

ত্রিপদী এবং পয়ার ছন্দ এই কবিতায় দেখা যায় ।

ত্রিপদী — চেগেছে বিষম যুদ্ধ তেগেছে কাবের শুদ্ধ
দেগেছে কামান শত শত ।

পয়ার — প্রয়াগেতে ছিল যত সিপায়ের দল ।

একেবারে সকলেতে হ'ন হতবল ।

কোথাও কবি বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করেছেন ৮।৮।১০ মাত্রার আবার কোথাও ৮।৮ মাত্রার কোথাও ৮।৮ , ৬।৬ মাত্রার পর । —

ক) অনল উঠিল জ্ব'লে কে করে নির্ধান । ৮।৬

সে অনলে অনেকেই পাইবে নির্ম্মাণ ।

(ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম)

খ) জ্ঞান হত পশু যত , আর কত জ্বালবে ? ৮।৮

ভূত বেশে যুদ্ধে এসে মিছে কেন চলাবে ?

(ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম)

গ) চারিদিকে গুণী গোলা কোথা পাবে দানা ছোলা

অশ্ব কাঁদে সেনা - মুখ চেয়ে । ৮।৮।১০

(ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম)

হে , শব , নর । মানব , বর । ৫।৫

রন , স , সুর । বচন ধর ।।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের ব্যবহার মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই ।

শিখিমুণ্ড , শত্রুদল , গৃহপাল , ফেরুপাল ইত্যাদি । যুদ্ধবিষয়ক কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাধুরীতি এবং চলিত রীতি দুয়েরই ব্যবহার নিপুন , ভাবে করেছেন ।

পারমার্থিক ও নৈতিক , সামাজিক ও ব্যঙ্গ , রসাত্মক এই সব পর্যায়ে ঈশ্বরগুপ্ত যে ভাষায় কবিতা লিখেছেন যুদ্ধ বিষয়ক পর্যায়ে তার চেয়ে পৃথক ভাব বা ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন ।

চেগেছে , তেগেছে , হেরেছে , তরেছে , ঘেরেছে , মেরেছে সবই যুদ্ধবিষয়ক কবিতার ভাষা । এই যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা যখন তিনি লিখেছেন তখন তিনি পুরো যুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন । বিভিন্ন পর্যায়ের কবিতা লেখার সময় কবি বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেছেন ইহা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় । যুদ্ধবিষয়ক কবিতাগুলি কবির ইতিহাস নিষ্ঠা ও ইতিহাস জ্ঞানের পরিচয় বহন করে । যুদ্ধের বিষয় যে সাহিত্যের সামগ্রী হতে পারে সেটা প্রমান করে ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর কাব্যকে তেজস্বিনী করতে চেয়েছেন ।

ইংরেজদের নিকট কবি আনুগত্য স্বীকার করেছেন । যুদ্ধবিষয়ক কবিতায় ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করে ইংরেজের প্রতিপক্ষের প্রতি নিন্দা ও কটূক্তি জঘন্য ভাষায় বর্ষণ করে কবি প্রতিক্রিয়াশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন । যদি তিনি কবিতাগুলিকে শুধু তাঁর কবিতার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতেন তবে কবিতাতে সুরের পার্থক্য থাকত । যদি তিনি প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতেন তবে বিদ্রোহীদের পরাজয়ে উৎফুল্ল হতেন না । বরং বীরদের নিয়ে কবিতা লিখতেন । তাঁর বিরোধ ইংরেজদের সঙ্গে ছিল না । বিরোধ ছিল ইংরেজ অনুকরণকারী বিভ্রান্ত বাঙালীর সঙ্গে ।

ঋতু - বর্ণন বিষয়ক :

নিসর্গচেতনা কবিমাত্রেরই বৈশিষ্ট্য । বিভিন্ন ঋতুতে নায়ক নায়িকার মনের পরিবর্তনকে কবিরা তাদের লেখনীতে এঁকেছেন । প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই নিসর্গ-চেতনা কাব্যে অল্প স্থান পেয়েছে । ঈশ্বরগুপ্তই প্রথম কবি যিনি নিসর্গকে কাব্যের শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছেন । পরবর্তী কবিরা তাঁদের কাব্যে বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের যুগে তিনিই একমাত্র কবি যিনি গ্রীষ্ম , বর্ষা , শরৎ, হেমন্ত , শীত ও বসন্ত ঋতুর বর্ণনা স্বতন্ত্র ভাবে দিয়েছেন । বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্করনে বিভিন্ন ঋতু বিষয়ক ২০ টি কবিতা সংকলিত হয়েছে । কালিদাস প্রমুখ মহাকবির বর্ণনায় আমরা দেখি নিসর্গের ওপর মানবত্ব আরোপ করা হয়েছে অর্থাৎ নিসর্গকে জীবন্ত করে তার ওপর মানবীয় গুণ আরোপ করেছেন । কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় এটি দেখা যায় না । তাঁর কবিতায় ঋতু গৌন । মানবের ওপর ঋতুর প্রভাবই মুখ্য । নিসর্গের রহস্যলীলাই তিনি বর্ণনা করেছেন । দারুণ গ্রীষ্মে বা দারুণ শীতে মানুষের জীবনে বিশৃংখলা এবং বিপর্য্যস্ত অবস্থায় যে অসঙ্গতির প্রকাশ পেয়েছে তাই কবি এই পর্যায়ের কবিতায় তুলে ধরেছেন । বিশৃংখলা এবং বিপর্য্যস্ত অবস্থার মধ্যে তিনি কৌতুক রসের সন্ধান করেছেন এটিই তাঁর কবি প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ।

গ্রীষ্ম কবিতায় কবি গ্রীষ্মের প্রচন্ড তাপের কথাই বর্ণনা করেছেন —

নিদারুন নিদাঘেতে নাহি পরিত্রান ।
জগতের প্রাণ নাশে জগতের প্রাণ ।।
অনিল করিছে বৃষ্টি প্রবল অনল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ।।

(গ্রীষ্ম)

মানুষের ওপর যেমন গ্রীষ্মের প্রভাব পড়েছে তেমনি প্রভাব পড়েছে পশুদের ওপর —

এক ঠাঁই রহিয়াছে রাক্ষস বানর ।
ময়ুর ভুজঙ্গে নাই দ্বন্দ্ব পরস্পর ।।
ছেড়েছে খলতা রোগ যত সব খল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ।।

পুরোহিত পূজার আসনে বসে মন্ত্র ভুলে যায় ।

প্রভাতে উঠিয়া মরে মিছে ফুল তুলে ।
পূজার আসনে ব'সে মন্ত্র যায় ভুলে ।।
শিবেরে ঠেকায়ে কলা কলা আগে চায় ।
খপ ক'রে তুলে নিয়ে গপ্ করে খায় ।।
ভূত পালে ফেলে দিয়া নিজ পেট ঢালে ।
কোমা ধ'রে ঢক্ ঢক্ জল ঢালে গালে ।।

(গ্রীষ্ম)

গ্রীষ্মের প্রখরতা স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে, মেয়েদের অবস্থা শোচনীয় করেছে —

সধবা হইল যেন বিধবার প্রায় ।
কেহ আর অলংকার নাহি রাখে গায় ।।
সদাই চঞ্চল মন বস্ত্র খুলে থাকে ।
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে অঞ্চলে না রাখে ।।

শরৎ , হেমন্ত , বসন্ত ঋতুগুলি মৃদু স্বভাবের । গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুর স্বভাব রূঢ় । শরৎ , হেমন্ত, বসন্ত ঋতুসকল ক্ষণস্থায়ী । নিজের প্রভাব বিস্তার করতে করতেই রূঢ় ঋতু সকল গ্রীষ্ম এবং শীত এসে হাজির হয় । ঈশ্বরগুপ্ত এই রূঢ় শীত ও গ্রীষ্ম মানুষের দুরবস্থার কথা চিত্রিত করেছেন ।

শীত সম্পর্কে কবি বলেছেন —

ক) শীতে মরি দেহ নহে বশ ।

খ) শীতের কেমন খড়ি উড়ায় অঙ্গের খড়ি ।
ফাটায় সবার পদ হাত ।

গ) শীত তুই বেশ বেশ দেখিয়া শীতের বেশ
জানিলাম কে বাবু কে ফোতো ।।

শীত এবং গ্রীষ্মের বর্ণনায় ঈশ্বরগুপ্ত নিসর্গ চেতনার পরিচয় বেশী দেন নি , নিসর্গ এখানে উপলক্ষ মাত্র । গ্রীষ্ম এবং শীতে মানুষের যে দুরবস্থা হয় তারই বর্ণনা কবি শীত এবং গ্রীষ্ম পর্যায়ের কবিতায় দিয়েছেন । অতএব এই দুই ঋতুর কবিতাকে আমরা নিসর্গমূলক কবিতা বলতে পারি না ।

ঈশ্বর গুপ্ত বর্ষা ঋতুকে নিয়ে নয়টি কবিতা লিখেছেন । 'বর্ষা ' কবিতাতে কবি বর্ষাকে "ঋতুপতি বর্ষারাজ " উপাধি দিয়েছেন । ঋতুপতি যেন সমরসাজে সজ্জিত হয়ে পৃথিবীতে উপনীত হয়েছেন । গ্রীষ্মের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ ।

গগনের সিংহাসনে বসিলেন হৃষ্ট - মনে
তিমিরের মুকুট মাথায় ।

.....

দৃশ্য অতি অপরূপ চিত্র করা নানারূপ
সমুদয় স্বভাবের সাজ ।।

এই সাজে সজ্জিত হয়ে তিনি যুদ্ধে এসেছেন । ঋতুরাজের পরিষদবৃন্দ হল ঝিল, বিল, নদনদী, সরোবর, সিন্ধু হ্রদ । বর্ষাপতির আগমনে সকলেই আনন্দিত —

সকলের এক বোল প্রেমানন্দে দিয়ে কোল
পরস্পর করে আলিঙ্গন ।

.....

নজর ধরিয়া ছলে বরষার পদতলে
যোড়করে প্রাণিপাত করে ।

ভেকপাল তার কোতোয়াল, চাতকচয় হল নকিব । এসব বর্ণনার মাধ্যমে কবি বর্ষাকে ঋতুরাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন । পারিপার্শ্বিককে কবি তুলনা করেছেন রাজা সমাগমের সময় যে অবস্থা হয় তার সঙ্গে । বর্ষার রূপ বর্ণনায় কবি চমৎকার কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । বর্ষার মহিমা একদিকে তিনি যেমন কীর্তন করেছেন অপরদিকে বর্ষা সমাগমে নদ - নদী, খাল - বিল কানায় কানায় ভরে ওঠে, জলভরা মেঘ কেমন নানা সুরে রাগ ভাজে তারপর বর্ষন করে । এই মেঘের ওপর বিদ্যুৎ স্বর্ণহারের মত খেলে যায় । বর্ষার এই রূপ কবি বর্ণনা করেছেন ।

পরবর্তীতে কবি বর্ষার রাজ্যাভিষেকের বর্ণনা দিয়েছেন ।

চাতক ময়ুর আর জলধর ভেক ।
বরষাকে করিন রাজ্যেতে অভিষেক ।। (বর্ষার রাজ্যাভিষেক)

জলধর হল সেনাপতি সে শরবৃষ্টি করছে এবং ভেকদল যশ ঘোষণা করছে । চাতকেরা আকাশে তূরী বাজাচ্ছে এবং ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নাচছে । গ্রীষ্মের প্রতি সে গর্জন তর্জন করছে ।

তবে যদি পাই দেখা দেখাইব তারে ।
এমন অন্যায় যেন রাজ্যে নাহি করে ।। (বর্ষার রাজ্যাভিষেক)

বর্ষাকে শুধু তিনি ঋতুরাজ বলে চুপ করে থাকেন নি, শীত এবং বসন্তকেও বলেছেন । বর্ষার বর্ণনায় কবি শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশেরই বর্ণনা করেছেন । ভেক, চাতক, ময়ূর, ময়ূরী, সেফালিকা, ভ্রমরকুল, আলিবৃন্দ এসব বর্ষারই উপমা । প্রাচীন কবিদের সঙ্গে একটু ফাঁক আছে কারণ কবি এখানে বিরহিনীকে তাঁর কাব্যে স্থান দেন নি ।

কবি বর্ণনা করেছেন শরৎকালের । তবে তাঁর "শরদ্বর্ণন" কবিতায় শরতের প্রকৃতি বর্ণনার স্পর্শ মেলে না পরিবর্তে আমরা পাই সেকালের দুর্গাপূজার আয়োজনের বিস্তৃত বর্ণনা । যাজক ব্রাহ্মনেরা চন্ডীপাঠ শিখছে —

যাজক ব্রাহ্মণ যারা চন্ডীপাঠ শিখে তারা
খন্ডিবারে জিহ্বার জড়তা ।
যজমান বড় আঁট পক্ষাবৃত্তি চন্ডীপাঠ
পাছে হয় কিঞ্চিৎ অন্যথা ।।

যাত্রাওয়ালারা নূতন গান পালা বেঁধে মহরা দিচ্ছে —

ক) যাত্রাকর করে যাত্রা কে বুঝে তাহার মাত্রা
প্রথমে মহলা করে দান ।

খ) যাত্রার যমক ভারি নামজাদা অধিকারী
আসর করিছে অধিকার ।

প্রবাসীরা গৃহে ফিরে আসছে, চারিদিকে দুর্গাপূজার আয়োজন ।

পশ্চিমের রেড়ো যত পূবের বাঙ্গাল কত
শত শত চলিয়াছে পথে ।

.....

ভবনে যাবার তরে পবনের বেগ ধরে
মাথার উপরে জুতা তোলে ।।

ইহাই শরদ্বর্ণন কবিতার বিষয়বস্তু । এই বর্ণনা আবেগহীন এবং যান্ত্রিক । উৎসবের পটভূমিও এতে নাই । এটিকে পুরোপুরি নিসর্গাত্মক কবিতা বলা চলে না ।

হিমঋতু বর্ণন কবিতায় দেখি কবিতাটি মৃদুস্বভাবের কবিতা । সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনছাড়া এই কবিতার অস্তিত্ব অনুভব করা যাবে না । হিমঋতু আধিপত্য বিস্তার করতে করতেই শীত তার পক্ষ বিস্তার করে হেমন্তকে বিদায় দিয়েছে ।

কবি হিমঋতুকে বলেছেন মহীপতি । সে হিমালয়ে বাস করে । সম্প্রতি সে রাজধানী ছেড়ে এসেছে । তবে তার সঙ্গে রাজ্যশাসন করার জন্য সেনানী হিমানী পিছে পিছে আসছে । তার ভরে সবাই কম্পমান ।

" জগতের অনিবার্য্য শাসিতে আপন রাজ্য
সাজিলেন শীত মহারাজা ।
সাজিলেন রাজা শীত ত্রিভুবন সশঙ্কিত
না জানি কাহার কি বা হয় " ।

এই শীতকে সবারই ভয় । শীত হৃদয়ে বিরহের আগুনকে আরো প্রজ্বলিত করে । যে একা সেই অভাগা এবং শীতে সে শেষ । হেমন্তের আগমনে সবাই আনন্দিত ।

" হিমঋতু আগমনে সবে আনন্দিত মনে
করিছে বিবিধ উপভোগ ।" (হিমঋতু বর্ণন)

হেমন্তে শরীর ও মন স্নিগ্ধতা লাভ করে —

" হিমে হয় স্নিগ্ধ সবে দেখা যায় অনুভবে
হেন রীতি হ'ল বিপরীত ।
হিমে দেহ দাহ হয় কেবা করে এ নিশ্চয়
অবিহিত হইল বিহিত ।। "

হেমন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছে । তার সঙ্গীরা রাজার জয় ঘোষণা করছে । হেমন্ত রাজের পারিষদ বর্গ হল — কুয়াশা , শিশির, ধান্যবৃক্ষ মাথা নত করছে পৃথিবীর কাছে , দীর্ঘ রজনী , বিষাদিনী কমলিনী , ম্লান ফুল ইত্যাদি । সব ঋতুর মধ্যে এই হিমঋতু জ্যেষ্ঠ , নিজগুন ও গৌরবে তাকে শ্রেষ্ঠতার আসন দিতে হবে।

হিমঋতুর শাসন যে দেখেনি সে জানে না জরজর থরথর করে ত্রিভুবন কাঁপছে । এই হেমন্তেই নলিনী এবং ভ্রমরের বিচ্ছেদ ঘটে । এই বিচ্ছেদ দেখে সূর্য হাসে কারণ বঞ্চনার ফল এটাই হয় ।

বসন্তবর্ণন — ঈশ্বরগুপ্তের "বসন্তবর্ণন" কবিতাটি একটি কোমল স্বভাবের কবিতা । হেমন্ত কাল বিদায় নেওয়ার পর বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে ।

বসন্ত সমাগমে কোকিলের আগমন বার্তা ঘোষিত হয়েছে । বসন্ত ধরনীতলে রাজধানী স্থাপন করেছে । সঙ্গে তার বলবান সেনা সমূহ - ভ্রমর , সরোবরের চলচল জল , ডাহুক ডাহুকী , খঞ্জন খঞ্জনী , সারস সারসী , কোকিল । হিমের শাসনে বনভূমি চুপ ছিল , বসন্ত সমাগমে তারা বনে শোভা বিস্তার করেছে ।

"দেখিয়া সে সব শোভা জগতের মনোলোভা
কোকিল করিছে কুহুরব ।"

পলাশ কাঞ্চন শিমুল ফুল , আম্রশাখা , ভূঁইচাঁপা , টগর , কুন্দ , মুচকুন্দ , গন্ধরাজ , গোলাপ , বেল , চামেলী , মাধবীলতা সকলেই বসন্ত সমাগমে আনন্দে মুখরিত । শীতকে রনে পরাজিত করে সে এসেছে ।

" মহানন্দ অহরহ বসন্ত সামন্ত সহ
বসিল গগন সিংহাসনে ।। "

বসন্তকে পেয়ে প্রকৃতি যখন আনন্দে উদ্বেলিত তখনই দেখা গেল তার সময় ফুরিয়ে এসেছে কারণ বসন্তকাল ক্ষণস্থায়ী । সকলের কাছ থেকে বসন্ত বিদায় চেয়েছে —

"আমার এ কলেবর অভাব - পূরিত ঘর
আমি নর চিরদিন দীন ।। "

ঋতু বর্ণন বিষয়ক পর্যায়ের কবিতায় আমরা দেখি কবির অন্যান্য পর্যায় থেকে এই পর্যায়ে কবিতার ভাব এবং ভাষাকে কবি সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে ব্যক্ত করেছেন । ঋতুর বর্ণনা করতে গিয়ে কবি প্রাণীকুলের ওপর বিচিত্র গুণ আরোপ করেছেন ।

"বাঘ হ'ল রাগহত তাপ নাই তার ।
শীকার স্বীকার নাই শীকারে বিকার ।।

শুধু প্রাণীকুল নয় উপমা প্রয়োগেও তিনি বিচিত্র উপমা ব্যবহার করেছেন । এই সঙ্গে গদ্যের ছোঁয়া তাতে রেখেছেন । যেমন —

ক) "ডাগর হইল পেট সাগর সমান" ।

খ) "পুরুষের ঘোর সাজা ঠিক যেন ছলে রাজা
পেটে পুরে জলের সাগর ।"

গ) "যে জলে অনল জ্বলে পুড়ে হই খাক্ ।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি গায়ে মেখে পাঁক ।।

ঘ) "আকাশ চাহিয়া আছে কাছে রেখে হাল ।"

সমাসোক্তি অলঙ্কার প্রয়োগ করে তিনি এই পর্যায়ের কবিতাকে আরো জীবন্ত করতে চেয়েছেন । যেমন —

ক) "দেখিয়া বন্ধুর দুখ বিষাদে বিদরে বুক
রজনীর মুখে নাই হাসি । "

খ) "হাসিয়া ভাতের হাঁড়ি জলে যায় ভেসে ।"

গ)" আকাশের ফুটিয়াছে তলা । "

ঘ) "কুমুদিনী বিষাদিনী লুকাইল দুখে ।"

ঙ) "জলের উঠেছে দাঁত । "

চ) "সৈন্য সহ পলাইল মহারাজ শীত । "

ছ) " শ্যামল তৃণের পরে নীহার বিহার করে

সাটিনে চুমকি যেন সাজে । "

যমক অলংকারও তিনি এই পর্যায়ে ব্যবহার করেছেন —

ক) " মধুর মধুর আশে ছুটিল ভ্রমর । "

খ) "ভালবাসা ভালবাসে বাঁধে ভালবাসা । "

গ) "কমল কমল মাঝে হাসে । "

ঘ) " জীবন জীবন সবাকার । "

ঙ) "সুরভি বরণ তুল সুরভি সুরভি ফুল

পেয়ে আজ সুরভি সুরভি ।"

চ) "প্রভাকর কর করে প্রভাকর কর করে

প্রভাকর করের কি ভাব ।। "

ডাকে প্রভাকর কর ওহে প্রভাকর কর

মনোময় হও দয়াময় ।

কেহ নাহি জানে গুপ্ত বলে হে ঈশ্বর গুপ্ত

তুমি ব্যাপ্ত চরাচরময় ।। "

ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার তিনি করেছেন প্রচুর পরিমানে । এতে তাঁর কবিতার মান উচ্চ পর্যায়ে উঠতে পারে নি । যেমন —

ক) " হড় মড় কড় মড় সদা করে মড় মড়
চড় চড় কড় কড় রব ।'

খ) " হুড় হুড় দুড় দুড় মেঘনাদ গুড় গুড় " ,

গ) "চপ্ চপ্ টপ্ টপ্ কলরব উঠে ।
কন্ কন্ ঝন্ ঝন্ হুহুঙ্কার ছুটে ।।
.....
ভন্ ভন্ ফন্ ফন্ মশকের ধ্বনি । "

ঘ) "সন্ সন্ সুরে গাজে ঝন্ ঝন্ মাঝে মাঝে
.....
ঝম্ ঝম্ হয়ে জল ধরাতল সুশীতল
ঘুচে গেল সন্তাপের জ্বালা ।। " (বর্ষার আবির্ভাব)

ঙ) "গুড় গুড় গুম্ গুম্ গুড়ুম গুড়ুম গুম্
বাজিতেছে রণ - জয় - ঢাক ।। " (বর্ষার অভিষেক)

চ) "ঝন্ ঝন্ ফন ফন সন্ সন ঝড়ে । " (বর্ষার ঝড়বৃষ্টি)

ছ) " ঢন্ ঢন্ হাত খাঁড়ি ভরসা মুড়ির চাড়ি
পানমাত্র খেজুরের রস । " (গীত)

অতিরিক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার তাঁর কাব্যকে সুত-ত্র করে তুলেছে ।

ঋতু বর্ণন পর্যায়ে ঈশ্বরগুপ্ত প্রচুর ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেছেন —

ক) " ও গড ও গড বলি টবেতে উনিয়া । "

খ) "নেটিব কেরুর সাৎ বল্‌তে কোর্ত্তে নেই বাৎ
ক্যালাম্যান ড্যাম তোরা ড্যাম
....
ও গড ও গড ড্যাম হাট । "

পশ্চিমের খোট্টাদের ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন ।

"উড়ে বলে হোরে ভাই সেটি গলা কাঁই পাই
শেঁহাড়ি পো শলা ।
....
বীমাবর্ত্তা বগমান আমপান রাখ জান
পূজা দিমু ড্যাড় আনা দিয়া । "

পশ্চিমের খোট্টাদের ভাষা ব্যবহার করে তিনি কবিতার এই পর্যায়ের ভাষাকে স্বকীয়তা দান করেছেন ।

তিনি ৮।৮।১০ মাত্রার পর বিরাম চিহ্ন তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন আবার কোথাও করেছেন ৮।৬ মাত্রার পর । কোথাও তিনি ব্যবহার করেছেন দীর্ঘত্রিপদী আবার কোথাও ব্যবহার করেছেন পয়ার ছন্দ । পয়ার এবং ত্রিপদীর অলঙ্ঘনীয় শাসন তাঁর কবিতাকে স্বতন্ত্র মন্ডিত করেছে ।

ঋতু বর্ণন পর্যায়ে আমরা দেখি নিদারুণ গ্রীষ্ম এবং প্রচন্ড শীতে মানুষের জীবনে যে শোচনীয় অবস্থা হয় তা নিয়ে হাস্য পরিহাসই যেন কবির উদ্দেশ্য ছিল। কৌতুক রস পরিবেশন ছাড়া কোন মহৎ উদ্দেশ্য এখানে নেই। তাঁর নিসর্গ কবিতা কোন শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে নি। এ সব বর্ণনা তাঁর যথার্থ নয়। কবিতাগুলি নিছক কবিতা নয় শুধু পদ্য মাত্র। ঈশ্বরগুপ্তের পরবর্তী কবিরা যখন নিসর্গ বর্ণনা করেছেন তখন বোঝা যায় তাদের নিসর্গ চেতনার প্রকাশ ঈশ্বরগুপ্ত অপেক্ষা উচ্চমানের। বলিষ্ঠ বাস্তব বোধ ও পরিহাস প্রবনতাই তাঁর প্রধান গুন ছিল। প্রকৃতি সম্পর্কিত যথার্থ কাব্যদৃষ্টি তাঁর ছিল না। প্রকৃতির ওপর মানবরূপের আরোপ করে তিনি একটি ক্লাসিকান দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। ঋতু সংহার কাব্যের বর্ষার রাজকীয় আগমনকে তিনি বিস্তারীত ভাবে বর্ণনা করেছেন। ঋতুবর্ণন পর্যায়ে তাঁর ভাষার অলঙ্করন অন্যান্য পর্যায় থেকে বেশী। তবে অলঙ্কারের ঘনঘটা তাঁর এই পর্যায়ের কবিতাকে বিষয়বস্তু অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়েছে বেশী। ভাষার নানিত্য, পদ বিন্যাস, চাতুর্য, রচনার পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য, ঘনঘন মিল, যমক, অনুপ্রাস ইত্যাদির প্রয়োগে ঈশ্বরগুপ্ত সমসাময়িক সব কবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

বি বি ধ :-

ঈশ্বরগুপ্ত পারমার্থিক ও নৈতিক, সামাজিক ও ব্যঙ্গ, রসাত্মক, যুথবিষয়ক, ঋতুবর্ণন এই সব পর্যায়ের কবিতা লেখার পর বিবিধ নামক পর্যায়ের কিছু কবিতা লিখেছেন। এই পর্যায়ের কবিতা অন্যান্য পর্যায়ের কবিতার চেয়ে

সম্পূর্ণ পৃথক । প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক থেকে কিছু কিছু কবিতা তিনি এখানে সঙ্কলিত করেছেন যেমন – ক্রোধ, অহংকার, হিংসা, লোভ । আবার অন্যপ্রকার কিছু কবিতা লিখেছেন যেমন – ছুটি, চার্বাকের মত, বিচিত্র হাস্য, সঙ্গীত বিদ্যা, কৃপন, রজনীতে ভাগীরথী ইত্যাদি । বিবিধ প্রকার বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে এই পর্যায়ে ।

'ছুটি' কবিতায় দেখি ছুটি সমাগমে প্রবাসীদের মনের অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে । ছুটি কম, দূরের পথ, পথে যেতেই ছুটি শেষ হবে এই ভেবে অদৃষ্টকে দোষারোপ করা হয়েছে ।

'ক্রোধ' কবিতায় ক্রোধকে বলা হয়েছে, এরূপ কদাকার । একে বিতাড়িত করাই শ্রেয় তবে সে বিতাড়িত হতে চায় না । ক্রোধ অতিশয় শক্তিশালী, এর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, সে কারো ধার ধারে না বরং সৃষ্টি আশা করলে প্রহারিত হয় ।

'অহঙ্কার' কবিতায় দেখি রূপগুণ ধনে সমৃদ্ধশালীকে সবাই সেবা করে । আত্মীয় পরিজন সবাই এই সমৃদ্ধশালীর অনুগত থাকে । টাকা দিয়ে সবার মুখ বন্ধ করে রাখা হয় । সে নিজের বলে বলীয়ান । তাকে কেউ স্পর্শ করবে না ।

'হিংসা' কবিতায় দেখি ঘরে ঘরে সকলের সুখ দেখে হিংসার উদ্রেক হয় ।

'চার্বাকের মত' কবিতায় শিষ্যের প্রতি চার্বাকের উক্তিতে দেখি নীতি উপদেশ তুলে ধরা হয়েছে ।

'ভারতভূমির দুর্দশা' কবিতায় ভারতের দুর্দশা দেখে কবির হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে যেমন বিদীর্ণ হয় সন্তানের হৃদয় জননীর দুর্দশা দেখে । রাহু যেমন শশধরকে

গ্রাস করে তেমনি ভারতভূমিকে বিজাতীয় রাজা গ্রাস করেন । সাহিত্যের সুধাভান্ড এতেই নিহিত আছে । আবার হিংসা দ্বেষ এবং সঙ্গে পূর্ণ এই দেশ । গর্ব এবং গরলে গুনের গৌরব শেষ হয়ে যায় । ষড়রিপুকে দমন করতে না পারলে সোনার ভারতভূমি ধ্বংস হয়ে যাবে । অতএব এই দুর্দশা থেকে ভারতভূমিকে বাঁচাতে হলে ঈশ্বরের করুণা প্রয়োজন ।

'প্রভাতে পদ্ম ' কবিতায় সূর্যের কিরণে সরোবরের যে শোভা হয়েছে সে রূপের তুলনা নেই । পদ্ম নিজের বাস বিতরণ করে আত্মপ্রকাশ করে । এই পদ্মের কলিতে মৌমাছি আসে এবং আত্মহারা হয় । মধুর রসে মোহিত হয়ে এক ফুল থেকে অন্যফুলে গিয়ে বসে এবং মধু সঞ্চয় করে । তারপর মধুলোভীরা এই সব মধু ভান্ড লুঠ করে ।

'শাস্ত্র ও শিক্ষা বিভ্রাট' কবিতায় দেখি ভারতের যশ জলাশয়ের মত । রবির কিরণে সব শুকিয়ে গেছে । তৃষ্ণায় মাতৃভাষাও শুকিয়ে গেছে । চর্চ্চার অভাবে বিদ্যাও লুপ্ত হয়ে যায় । মনিহারা সাপের মত ধনিই তার সার । অপমান এবং অনাদরে যারা অবহেলিত হয় তাদের কেউ সমাদর করে না । ভারতবর্ষের ভারতের বাসা নেই । পুরানকে পুরান বলে উপহাস করা হয় । অন্ধকারে পথ দেখবে এমন দৃষ্টি কার আছে ? গরল খেয়ে সরল ভাব দেখায় । দ্বেষাচার মদে মত্ত হয়ে দেশাচার করছে । তীব্র বিষকে সুধা মনে করছে ।

'বুলবুল পক্ষীর যুদ্ধ ' কবিতায় ধনীর পাখী রাজার কাছে স্বাধীন ভাবে ছিল কিন্তু শিশুর হাতে যখন পড়ল তখন তার স্বাধীনতায় শৃংখল পড়ল । একে একে রাজার পাখী সবাই এই শৃংখলের কাছে নত হল । রাজা এই নতি স্বীকার করতে না পেরে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন ।

'মন পথিক ' কবিতায় মনকে পথিক রূপে কল্পনা করে তাকে সতর্ক করা হয়েছে — তুমি পথিক রূপে কোথায় যাও , ভুলের গহন পথে কার দেখা মিলবে । সংসারে সবই অস্থায়ী , স্থায়ী কিছু নয় । কুসুম যেমন গন্ধ বিতরণ করে , ঈশ্বরও আত্মারূপে দেহে অবস্থান করেন । নিজের ভাল করতে হলে এই আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তা করা উচিৎ । ভাবনার দ্বারাই ব্রহ্মপদ লাভ করা যায় । তর্কে কোন লাভ হয় না বরং জ্ঞানকে সঙ্গে করে পথ চলতে হয় ।

বিবিধ পর্যায়ের কবিতাগুলি আলোচনা করে দেখা গেল প্রতিটি কবিতারই বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র । এই স্বতন্ত্রতার জন্যই হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্যায়ের কবিতাগুলির নাম দিয়েছেন বিবিধ বিষয়ক । বিবিধ এই কবিতার রচনা শৈলী । সহজ সরল গ্রাম্য ভাষা তিনি বিবিধ পর্যায়ের কবিতায় ব্যবহার করেছেন । যেমন —

"হ্যাদে এসে খেঁসে খেঁসে বসেছে নিকটে এসে
গদী ঠেনে হেসে হেসে করে কি ব্যাভার ।। " (ক্রোধ)

"হ্যাদে দেখি ঘরে ঘরে সকলেই যায় পরে
সুখে আছে পরস্পর আজো এরা মরেনি ।। '' (হিংসা)

" হ্যাদে ওই খালা খানা যদি ভাই যায় আনা
দুদিন ত' হবে তায় সুখেতে যাপন ।। " (লোভ)

'হ্যাদে' এই মধ্যযুগীয় শব্দটি তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন ।

সংস্কৃত শব্দ তিনি বিবিধ পর্যায়ের কবিতায় ব্যবহার করেছেন । যেমন —

"কদম্ব - কুসুম - অনু তনু পুলকিত ।" (সঙ্গীত শিক্ষা)

"কালরবি করে করে শুষ্ক সমুদয় । " (শাস্ত্র এবং শিক্ষা বিভ্রাট)

কিছু কিছু ইংরাজী শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন —

" সে মেনে সে মেনে কি না আসে যে ফিমেল ।

মেন হয়ে এবার কি পাব না ফিমেল ? " (ছুটি)

" টাইম বাড়াতে ছিল বাসনা রাজার " (বুলবুল পাখীর যুদ্ধ)

ইডিয়ম তিনি ব্যবহার করেছেন এই বিবিধ পর্যায়ের কবিতায় তবে তা সংখ্যায় খুব কম ।

" মানুষ যানস ফল মোহ আর ভ্রমে " । (ভারত ভূমির দুর্দশা)

" কটুতা কীটের যাহে নিতি মিলে বাসা " । (")

" কুকুর ঠাকুর হয় ধন পেলে পরে । " (ধন)

" মণি পেলে ফনী হন কুলীনের ছেলে " । (")

" পেটে খেলে পিঠে সয় " (লোভ)

পয়ার , ত্রিপদী , দীর্ঘত্রিপদী সব ছন্দই তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায় ।

পয়ার - " শুনিয়া ছুটির কথা কুঠিয়াল যত । ৮।৬

গালে হাত চিৎপাত প্রাণ ওষ্ঠাগত ।। " (ছুটি)

ত্রিপদী - " রূপে গুণে মানে ধন পরিমানে

আমার সমান কেবা । ৬।৬।৮

দেখ শত শত দাস দাসী কত

সতত করিছে সেবা ।। " (অহঙ্কার)

দীর্ঘত্রিপদী - " ধর্ম্মপথে হয়ে চোর কেন পাও দু:খ ঘোর

নয়নের অগোচর নাই কিছু নাই কিছু ।

স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ সেই ভোগ দেন - যোগ

পরকালে ভোগাভোগ নাই কিছু নাই কিছু ।।"

৮।৮। ১৬

(চার্ব্বাকের মত)

বিরামচিহ্ন তিনি ব্যবহার করেছেন ৮।৬ মাত্রার পর কোথাও ৬।৬।৮ মাত্রার পর আবার কোথাও ৮।৮।১৬ মাত্রার পর ।

অনুপ্রাস অলঙ্কার ঈশ্বরগুপ্ত এই বিবিধ পর্যায়ের কবিতায় ব্যবহার করেছেন । —

" শ্রী গোপাল পক্ষ হয়ে পক্ষ পক্ষ করি ।

করিল বিপক্ষ জয় এক পক্ষ করি ।।

এক পক্ষ ছুটি পেয়ে দূরে গেল ধাঁদা ।

শুক্ল পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষে সাদা ।।' (ছুটি)

"ওরে ভন্ড হাতে দন্ড এ কেমন রোগ ।

দন্ডে দন্ডে নিজ দন্ডে দন্ড কর ভোগ ।। " (চার্ব্বাকের মত)

যমক অলংকারও তিনি ব্যবহার করেছেন । —

" ভারতে না রহে আর ভারতের বাস ।

পুরান পুরান বলি করে উপহাস ।।" (শাস্ত্র এবং শিক্ষাবিভ্রাট)

"জলহীন মীনসম যত হি-দুগণ ।
জীবন জীবন করি হারায় জীবন ।। "

(শাস্ত্র এবং শিক্ষাবিভ্রাট)

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঈশ্বরগুপ্ত এই বিবিধ পর্যায়ের কবিতায় করেছেন —

"মর্ মর্ সর্ সর্ ওরে ওরে ধর্ ধর্
কাট্ কাট্ কেটে ফেল মার মার মার ।" (ক্রোধ)

"প্রভাকর যত যত কেউ নোস্ অবগত
দূর দূর দূর পশু মর্ মর্ মর্ মর্ মর্ ।
তোরা মর্ মর্ মর্ মর্ । (অহঙ্কার)

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় শ্রেণীবিভাগ পর্যালোচনা করে দেখলাম প্রতিটি পর্যায়ের কবিতার সঙ্গে প্রতিটি পর্যায়ের কবিতার বিস্তার ব্যবধান রয়েছে । ব্যাকরনের দিক থেকে তিনি সমতা রক্ষা করে চলেছেন যেমন – ধ্বন্যাত্মক শব্দ , অনুপ্রাস অলংকার বা যমক অলংকার , ছন্দ ইত্যাদি তিনি প্রতিটি পর্যায়ের কবিতাতেই ব্যবহার করেছেন । তবে বিষয়বস্তু বা ভাষা প্রতিটি পর্যায়ে স্বতন্ত্রের দাবী রাখে । ঈশ্বরগুপ্ত ব্যঙ্গ ধর্মী বা সামাজিক পর্যায়ের কবিতা লিখতে যে বিষয়বস্তু বা ভাষা ব্যবহার করেছেন পারমার্থিক ও নৈতিক পর্যায়ের কবিতা লিখতে গিয়ে সেই ভাষারীতির ব্যবহার করেন নি । আবার যুদ্ধ - বিষয়ক কবিতায় যে বিষয়বস্তু বা ভাষা ব্যবহার করেছেন প্রকৃতিবর্ণন পর্যায়ে সে ভাষা রীতি তিনি ব্যবহার করেন নি ।

নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতাগুলিকে নীরস মনে হতে পারে তবে এই কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকৃত কবিমানসের পরিচয় পাওয়া যায় । এই পর্যায়ের কবিতাতে কবির জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে । আবার সামাজিক ও ব্যঙ্গ পর্যায়ের কবিতায় কবি ব্যবহার করেছেন ইঙ্গ বঙ্গ ভাষা ।

যেমন —

" রিফরম প্রটেষ্টান্ট বিশপের দল ।

বড়দিন পেয়ে মুখে হাস্য খলখল ।। " (বড়দিন)

বাঙ্গালীর কাছে মাতৃভাষা একসময় তাচ্ছিল্যের বস্তু ছিল । কারণ একদিকে গোঁড়া সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত এবং অপরদিকে ইংরেজী শিক্ষানবীশের দল বাঙ্গলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হত না , তখন গুপ্তকবি লিখেছেন — " দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ " । এবং এই বাঙ্গলা ভাষায় আত্মনিয়োগ করেছেন । তিনি বঙ্গ সাহিত্যযজ্ঞের প্রথম হোতা , প্রথম বাঙ্গালী কবি " (২৩)

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংরেজীর মোহে যখন বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষাকে অবহেলা করছিল সেই অনাদৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কবি লিখেছেন —

" থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে

কে কোথায় এমন দেখেছে ? " (২৪)

তারপর তিনি লিখলেন —

" কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি

বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া । " (২৫)

---

(২৩) বসু সজীব , ঈশ্বরগুপ্ত , ঈশ্বরগুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রকাশন , আগষ্ট ১৯৬৪ পৃ : ২২.

(২৪) তদেব , পৃ : ২৩.

(২৫) তদেব ।

ইংরেজীয়ানাদের প্রতিই তিনি শুধু খারাপ ব্যবহার করেন নি, সংস্কৃত শিক্ষানুরাগীদের প্রতিও কটাক্ষ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "তাঁহার বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন এমন একটি খাঁটি বাংলায় বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায় আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছু লেখে নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না। সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের মনের ভিতরে প্রবেশ করে। কেবল ভাষা নহে, ভাবও তাই। ঈশ্বরগুপ্ত দেশী কথায় দেশী ভাব প্রকাশ করেন।" (২৬)

উড়ন্ত ফানুস দেখে কবি আটপৌরে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন —

"উড়িয়াছে আকাশেতে সুচারু ফানস ।
তাহাতে মানুষ বলে প্রফুল্ল মানস ।।"

তাঁর আটপৌরে ভাষার আরো পরিচয় পাই "বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব" কবিতায় —

"এঁদে দেয় ফুফু নানী কলুই ভেলের পানি
কাঁচাক্যানা কেচুর ছানন।"

সামাজিক ও ব্যঙ্গ পর্যায়ে তিনি ভাষার যে শৈলী ব্যবহার করেছেন ঋতুবর্ণন পর্যায়ে তা করেন নি। এ পর্যায়ে তিনি ব্যবহার করেছেন ভাষার আটপৌরে রূপকে।

যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাতে দেখা যায় সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি যুদ্ধ-বিষয়ক ঘটনাগুলিকে ছন্দোবদ্ধ করে নতুন রীতিতে কবিতা লিখেছেন। ইংরেজ রাজত্বে

---

(২৬) ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ: ২২

বাস করে যে দু:সাহসিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা অতুলনীয় । যুদ্ধবিষয়ক ঘটনাগুলিকে নিয়ে কবিতা লেখার ফলে তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনেক কাহিনীই আমরা জানতে পেরেছি ।

ঈশ্বরগুপ্তের 'কালকন্যার সহিত বর্ষা বরের বিবাহ' কবিতায় দেখি মহাকালের খন্ড রূপকে সমাজ সমর্থিত এক বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করে বর্ষাকে বরের ভূমিকায় সাজিয়ে নবরসের সূচনা করা হয়েছে । কবি বর্ষাকে বলেছেন —

" বিবাহ হইল শেষ , ওহে বর্ষাবর ।
যাদু নিয়া ঘরে গিয়া বউভাত কর ।। "

এতে রসিকতা এবং তত্ত্বমূলক অনুভূতি আছে । অধ্যাত্ম চিন্তার সঙ্গে সমাজ চিন্তার এক সমন্বয় আমরা ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে পাই । বিবিধ পর্যায়ের কবিতায় দেখা যায় বিষয়বস্তু ও ভাষার দিক থেকে এক অপূর্ব সমন্বয় গঠিত হয়েছে ।

তাঁর কবিতার প্রধান গুণ ব্যঙ্গ - বিদ্রুপ ও পরিহাস । এর প্রধান কারণ হল ব্যক্তি জীবনের দু:খ কষ্ট এবং অবিচার । তাঁর কবিপ্রতিভা তাঁরই সহজাত । তিনি সচেতন ভাবে ভাষা ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ।

ভারতচন্দ্রের আমল থেকে বাংলা কাব্যে যাবনী মিশাল ভাষার ব্যবহার শুরু হয়েছিল । ঈশ্বরচন্দ্র এই পথ থেকে সরে এসে একটি নিজস্ব রীতিতে কবিতা লিখতে শুরু করেন । এই রীতিতে তাঁর ভাষা তেজস্বিণী হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ এই নিজস্ব রীতিকে বলেছেন " স্নিগ্ধ পরিহাস । " (২৭)

---

(২৭) দত্ত ভবতোষ , ঈশ্বরগুপ্ত , ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব ,
জিজ্ঞাসা , ১৯৬৮ , প্রথম প্রকাশ , পৃ : ২১৮ .

ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে সরলতার প্রকাশ দেখা যায়। তিনি মেকির পরম শত্রু ছিলেন। সারল্য তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে অতিরিক্ত স্থান পেয়েছে। এই সারল্যের জন্য তিনি একদিকে ব্যবহার করেছেন প্রাত্যাহিক সংসারের ভাষা আবার অন্যদিকে যমক এবং অনুপ্রাস অলংকার অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। এই অলংকার ব্যবহারের জন্য তিনি সমাজের যে কোন স্তর থেকেই ভাষা সংগ্রহ করেছেন। অলংকারের আতিশয্যে তাঁর কবিতা অনেক সময় সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় নি।

কবিতা লেখার সময় তিনি নিঃশেষ করে বক্তব্য প্রকাশ করতেন এবং তা খাঁটি বাংলা ভাষায়। যতদূর সম্ভব তিনি যুক্তাক্ষর বর্জন করে লিখতেন।

ঈশ্বর গুপ্ত তৎসম ও সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন — সংযোগী, স্বভাব, ব্যবহার, উপকার, উপদেশ, অভিধান, ত্রিসংসার, পরিচ্ছদ-যুক্ত, সুশোভিত, সুপ্রকাশ্য, প্রেমসুধাহার, শুদ্ধাচার, স্থিরবুদ্ধি, ত্রানকর্ত্রী, হিতাহিত, হীরকাদি, চর্ম্মচক্ষু ইত্যাদি।

আঞ্চলিক এবং অন্ত্যজ শব্দ ভান্ডার থেকে তিনি বহু শব্দ সংগ্রহ করেছেন। যেমন — তুড়ি, দেওয়ান, বিবিজান, নবেজান, হ্যায়, ক্যাক, উল্কি, বিচিনি, ভুষি, ঘুষি, গামলা, ঠ্যাং, হাড়গিলে, শিং, কাঁৎকা, বিলাতী, তুড়ী, ছুঁড়ী, হাঁপ, আঁব, ছ্যাঁকছ্যাঁক, বলিহারি, মামলা, আমলা ইত্যাদি।

এই অন্ত্যজ ভাষার পাশাপাশি আবার ব্রাহ্মণ্য ভাষাও আছে। এই ব্রাহ্মণ্য ভাষা হল — মাতৃভাষা, স্বদেশ, কবি, আত্মবিলাপ ইত্যাদি কবিতায়, আবার অন্ত্যজ মহলের ভাষার কবিতা হল — পাঁটা, এন্ডারওয়ালা তপস্যা মাছ, নববর্ষ

পৌষপার্বণ । এই অন্ত্যজ মহলের ভাষায় আছে হালকা লঘু চান । তিনি তাঁর কালের এবং সমাজের চলতি শব্দগুলোকে তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন ।

শব্দকৌশল প্রবনতা এবং সংকৃত প্রকাশ রীতি তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায় । ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করে তাঁর কাব্য ভাষার মৌলিক উপাদান আলোচনা করা হল ।